August 2021 | Vol 02 | Issue 08

বিজ্ঞান কথা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিজ্ঞান সাধনা

স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদযাপনের মুহূর্তে আমাদের প্রয়াস থাকবে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজ্ঞানসাধকদের অবদানের অজানা কাহিনীগুলোকে তুলে ধরা।

বাংলা বিজ্ঞান সম্প্রচারের ইতিহাস পরিক্রমা: একটি রূপরেখা

পরাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণায় স্যার আশুতোষের অবদান

বাংলায় জনবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের ঐতিহ্য

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে দুই বিজ্ঞানীর ভাবনায় ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষ

বি P
V প্র
VIGYAN PRASAR

বিজ্ঞান কথা

August 2021 | Vol 02 | Issue 08

মুখ্য সম্পাদক
ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদক
ডঃ রিন্টু নাথ

সম্পাদকীয় ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধান
অমিতেশ ব্যানার্জী

উপদেষ্টামন্ডলী
ডঃ গৌতম বসু
ডঃ জিষ্ণু বসু
ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী
প্রোঃ মৈত্রী ভট্টাচার্য
ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী
প্রোঃ সমীর সাহা
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী

অলঙ্করণ
পিয়ালী ডিজাইন

যোগাযোগের ঠিকানা
বিজ্ঞান প্রসার, এ-৫০, ইন্সটিটিউশনাল এরিয়া,
সেক্টর ৬২, নয়ডা -২০১ ৩০৯ (উ.প্র.)
ফোন
+৯১-০১২০ ২৪০৪৪৩০
ফ্যাক্স
+৯১-০১২০ ২৪০৪৪৩৭
ইমেল
vigyankatha@vigyanprasar.gov.in
ওয়েবসাইট
www.vigyanprasar.gov.in

"বিজ্ঞান কথা"য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখক ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে বিজ্ঞান প্রসার কোনভাবে দায়বদ্ধ থাকিবে না।

"বিজ্ঞান কথা" য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোন মুদ্রণমাধ্যমেই বিজ্ঞান প্রসারের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

বিজ্ঞান প্রসার
এ-৫০, ইন্সটিটিউশনাল এরিয়া,
সেক্টর ৬২, নয়ডা -২০১ ৩০৯ (উ.প্র.)-এর
পক্ষে নকুল পারাশর দ্বারা প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ
বিজ্ঞান সাধকদের স্মরণে

আমাদের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে পদার্পণের প্রাক্কালে আমরা প্রণাম জানাই সেই সমস্ত বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আজকের সুন্দর সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষ। সারা দেশে শুরু হয়েছে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তির বর্ষব্যাপী উদযাপন। বিজ্ঞান প্রসারও এই উৎসবে অংশীদার হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা এই উৎসবে তুলে ধরবো পরাধীন ভারতের বিজ্ঞান সাধকদের অদম্য উদ্যমের কাহিনী। সেদিনের সেই কঠিন সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে তাঁদের অতুলনীয় অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। স্মরণ করি সেই সব কাহিনী, যেখানে বহু বিজ্ঞানসাধকের চিন্তাশীল গবেষণা বা তাঁদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় নেমে এসেছিলো প্রতিবন্ধকতা।

ছোটবেলা থেকেই আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীরগাথা শুনেছি। তুলনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের লক্ষে নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা কত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছেন সে সম্পর্কে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। আমরা সকলেই জানি যে তাঁদের সাফল্যের পথটি মসৃণ ছিল না। তাঁরা ক্রমাগত বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছেন। কেউ যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের বিজ্ঞানীরা যে সব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন সেগুলি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, বিপুল পরিমাণ তথ্য আমাদের হাতে আসবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব অনাদিকাল থেকেই সবাই উপলব্ধি করেছে। ব্রিটিশরাও এর ব্যতিক্রমী ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের দশ বছর পরে ১৭৬৭ সালে রবার্ট ক্লাইভ 'ভারতীয় সর্বেক্ষণ সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত সংস্থাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। তারা বুঝতে পেরেছিল যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগ ব্যতিরেকে এই দেশকে চেনা তাঁদের জন্য অসম্ভব। এই সংস্থার মাধ্যমে দেশের মানচিত্র গঠন তৎকালীন সরকারকে দেশের বিভিন্ন অংশকে চেনার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। সাথে সাথে তারা এটাও স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, যদি ভারতীয় জনগণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বাধুনিক উন্নয়ন থেকে দূরে রাখা যায় তবে তাদের পক্ষে ভারতবর্ষকে শাসন করা অনেক সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। তবুও, আমাদের বিজ্ঞানীরা তাদের নিবিড় সংকল্প, আত্মসম্মান এবং দেশপ্রেম দিয়ে তাঁদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রমথ নাথ বোস প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে ভারতীয় সর্বেক্ষণ সংস্থায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্বদেশী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত এক অনন্য ভূতাত্ত্বিক। সুপারিনটেনডেন্ট পদের জন্য যোগ্যতম প্রার্থী হাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বঞ্চিত করে এক কনিষ্ঠ ইংরেজকে ওই পদ দেওয়া হয়। আত্মমর্যাদা ও জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন বোস ভারতীয় সর্বেক্ষণ সংস্থা থেকে পদত্যাগ করেন এবং দেশীয় রাজ্য ময়ুরভঞ্জ স্টেটে ভূতত্ত্ববিদ হিসাবে যোগদান করেন। আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ইতিহাসে তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের প্রথম ভারতীয় স্নাতক। তিনি প্রথম আসামের প্রাকৃতিক তৈলভাণ্ডার আবিষ্কার করেন, ভারতের প্রথম সাবান কারখানা স্থাপন করেন। তিনিই 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিতি পায় এবং জামশেদপুরে টাটা স্টিল গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

সেই সময়কালে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও বঞ্চনার এরকম বহু উদাহরণ আছে, এবং এর অনেকগুলিই কলকাতাকেন্দ্রিক। কলকাতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পুনেতে, বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী শঙ্কর পুরুষোত্তম আগারকার সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে বিজ্ঞানচর্চার জন্য 'মহারাষ্ট্র এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সাইন্সেস' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শোনা যায় যে, এর জন্য তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং স্ত্রীর গহনাপত্র বিক্রি করতে হয়েছিল। পুনেতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে 'আগারকার ইনস্টিটিউট' নামে পরিচিত।

স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি উৎসবের বর্ষব্যাপী উদযাপনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞান পথিকৃৎদের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবো বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত আমাদের মাসিক পত্রিকাগুলির বিশেষ সংখ্যায় তাঁদের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে, বিশিষ্ট বিজ্ঞান ব্যক্তিত্বদের সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক বক্তৃতা শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে। একটি ডিজিটাল পোর্টালে প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞান ব্যক্তিত্বদের জীবন ও কর্ম বিষয়ক অনুপ্রেরণামূলক কাহিনীগুলি পাঠকদের জন্য সহজ ব্যবহারযোগ্য আকৃতিতে একত্রিত করা হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক পরিকল্পনা রয়েছে পরাধীন দেশের বিজ্ঞান সাধনাকে সবার কাছে তুলে ধরার জন্য। এই অনুপ্রেরণামূলক উদযাপনে আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকুন। •

ড.নকুল পারাশর

মুখ্য প্রবন্ধ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিজ্ঞান সাধনা

জয়ন্ত সহস্রবুদ্ধে

সাধারণত মনে করা হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল মূলত রাজনৈতিক, তার সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটও জড়িত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা তাতে বৈজ্ঞানিকদের অংশগ্রহণের কাহিনী আজও অনেকাংশে উপেক্ষিত। এমনকি বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত অনেকের জন্যই এই কথাটি সত্য। আজ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদযাপনের মুহূর্তে আমাদের প্রয়াস থাকবে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজ্ঞানসাধকদের অবদানের অজানা কাহিনীগুলোকে তুলে ধরা।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিজ্ঞান – এই দুই কথার মধ্যে প্রথম স্বাধীনতা কথাটাকে তলিয়ে দেখা যাক। ইংরেজিতে একে ইনডিপেনডেন্স বা ফ্রিডম বলা হয়, যার সাধারণ অর্থ মুক্তি। উর্দুতে বলা হয় আজাদী। কিন্তু আমরা এই সংঘর্ষকে মুক্তি সংগ্রাম বলি না, বলি স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম যার মধ্যে 'স্ব' অংশটা অত্যন্ত ব্যঞ্জনাপূর্ণ। আমরা জানি ব্রিটিশের ভারতে আগমন আমাদের দেশে প্রথম বা একমাত্র বৈদেশিক অনুপ্রবেশ ছিল না। এর আগেও অনেকবার ভারতে বৈদেশিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে অন্য সব অনুপ্রবেশের সাথে ব্রিটিশ ঔপনিবেশকতার কিছু মৌলিক পার্থক্য ছিল। সাধারণত বৈদেশিক আক্রমণের পেছনে তিনটি কারণ কাজ করে – রাজ্য দখলের লোভ, জোর করে নিজেদের মতবাদ বিজিত জনতার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ও আর্থিক লুটতরাজ। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাকে বিচার করতে গেলে কিছু নতুন দিকও সামনে আসে। এর আগের অনুপ্রবেশকারীদের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত বেশির থেকে বেশি সম্পদ লুট করা। সেসময় ভারত ছিল বিশ্বের অন্যতম সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ দেশ। এই সম্পন্নতা ও সমৃদ্ধি শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই ছিল না, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও এই দেশ ছিল বিশ্বের অগ্রণী যা লুণ্ঠনকারীদের বারবার আকর্ষিত করেছে। এমনকি ইউরোপীয়দের মধ্যেও যখন অন্য দেশ থেকে আর্থিক ও বৌদ্ধিক সম্পদ লুটের চিন্তা এসেছে, তাদের প্রথম মনে হয়েছে ভারতবর্ষের কথা। তারা ভারতগামী সমুদ্রপথের খোঁজে সচেষ্ট হয়েছে। প্রথমে কলম্বাস ভারতে আসার উদ্যোগ নিয়ে পথভুলে ১৪৯২ সালের ১২ই অক্টোবর আমেরিকার উপকূলে পৌঁছান। তারপর ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-দা-গামা প্রথম ভারতের কোঝিকোড় বা কালিকট বন্দরে পাঁছান।

সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় ১৬১০ সালে ব্রিটিশ প্রথম ভারতে পা রাখে মূলত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। ওই সময় প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য ইংল্যান্ডে স্থাপিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এই ব্যবসায়ী সংস্থার প্রতিনিধিরা ভারতে আসার সাথে সাথে চীনের ওপরও তাদের নজর ছিল ঠিকই; কিন্তু প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারত। সেসময় ব্রিটিশদের সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি ও জার্মানরাও ভারতে ঘাঁটি গেড়েছিল, তাদের সবার মধ্যেই তাদের নিজেদের দেশ থেকে ভারতগামী সমুদ্রপথের অধিকার নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতা চলছিল।

ব্যবসা চালাবার জন্য ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যে লড়াই অব্যাহত ছিল, সুতরাং আত্মরক্ষার খাতিরে তারা ছোট ছোট সৈন্যদলও গঠন করেছিল। সেইসময় এই সব গোষ্ঠীগুলি দেশীয় রাজাদের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করে চলেছিল, যার মধ্যে বাংলার নবাবও ছিলেন। তার সাথে বাণিজ্য চুক্তিতে সফল হন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ অধিকারী রবার্ট ক্লাইভ। ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল ফরাসিরা যেন বাংলায় বাণিজ্যের সুযোগ না পায়। এই কারণে ১৭৫৭ সালে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের এক যুদ্ধ হয় যা পলাশীর যুদ্ধ বলে খ্যাত এবং এই যুদ্ধে ক্লাইভ জয়লাভ করে বাণিজ্যের সাথে সাথে বাংলা ও বিহারের কর সংগ্রহেরও অধিকার লাভ করেন। এর ফলে ব্যবসায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজ্য শাসনের পথে পা বাড়ায়। এই ঘটনাকেই ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সূচনা বলে মনে করা হয়।

আমরা বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত লোকেরা ভালোভাবেই জানি যে সেইসময় ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানের সহায়তায় শিল্পের বিকাশ ঘটেছিলো। ১৭৬০ সালে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থের প্রয়োজন ছিল। বাংলা ও বিহারের রাজস্ব আদায়ের কারণে প্রচুর অর্থ ব্রিটিশদের হস্তগত হয়, পাশাপাশি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কারণে তারা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদেরও অধিকারী হয়ে ওঠে যা প্রথম শিল্পবিপ্লবের চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়।

আমরা সবাই উপনিবেশবাদ শব্দটির সাথে পরিচিত। তখনকার ইউরোপে সমস্ত দেশ সচেষ্ট ছিল অন্য দেশে নিজেদের লোক পাঠিয়ে ক্রমে সেই দেশকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করতে। শিল্প বিপ্লবের দেড়শ বছরেরও বেশি আগে একই উদ্দেশ্যেই কলম্বাস ভারতের সন্ধানে যাত্রা শুরু করে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা পৌঁছে যান। বিখ্যাত ভৌগোলিক টলেমির মতে পৃথিবীর ভূভাগের মোট তিনটি অংশ ছিল – এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ। এছাড়া অন্য কোনো ভূখণ্ডের কোনো ধারণা সেইসময় ছিল না। কলম্বাস যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি যেখানে পৌঁছেছেন তা ভারত নয়, অন্য কোনো জায়গা, তাঁর মনে হলো যে তিনি যেন এক নতুন বিশ্ব আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ইউরোপের লোকেরা ধীরে ধীরে আমেরিকায় বসতি গড়ে তুলতে থাকে। বৈশিষ্টগত দিক থেকে একে বলা হতো সেটেলার কলোনী। ব্রিটিশরা সেখানে পৌঁছে ধীরে ধীরে তাদের জনসংখ্যা বাড়িয়ে স্থানীয় লোকেদের পরাজিত করে নিজেদের অধিকার স্থাপন করে।

আমেরিকা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু সেখানকার ব্রিটিশ অধিবাসীরা ক্রমে ব্রিটেনের রাজার অধীনে থাকতে আপত্তি জানায়। ফলে ১৭৭৫ সালে শুরু হয় মার্কিন স্বাধীনতার যুদ্ধ, যা ১৭৮৩ পর্যন্ত চলেছিল। একইভাবে ভারতেও ১৮৫৭ সালে শুরু হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ। তখন ইংল্যান্ডে শিল্পের বিকাশ শুরু হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই আমেরিকা থেকে শিল্প সহায়ক প্রাকৃতিক সম্পদের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তখন তাদের নজর কেন্দ্রীভূত হয় ভারতের দিকে।

১৭৫৭ সালের যুদ্ধে তাদের যে জয়লাভ ঘটেছিলো তার কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পরাক্রম নয়, বরং বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের কারণেই তাদের জয়লাভ হয়। এই নীতিকেই কাজে লাগিয়ে ১৮১৮ সাল নাগাদ তারা মারাঠা রাজ্যকে পরাজিত করে। অর্থাৎ মাত্র ষাট বছরের মধ্যে তারা বর্তমানের পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মায়ানমার, বাংলাদেশ সহ তৎকালীন অখণ্ড ভারত বলে পরিচিত সমগ্র ভূখণ্ডের মালিক হয়ে বসে। ভারত ছিল তাদের কাছে সম্পদের ভান্ডার। ব্রিটিশদের মতে ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন। তাদের কাছে ভারতের এই গুরুত্বের মূল কারণ ছিল শিল্পের বিকাশে ভারতের সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার।

ভারতকে শাসন করতে ব্রিটিশের দরকার ছিল বিজ্ঞানের সহায়তা। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অন্তর্গত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের ওয়েবসাইট দেখলে একটি কৌতূহলোদ্দীপক কথা চোখে পরে। লেখা আছে, "the oldest scientific department and institution of the Government of India is Survey of India which was established by British people in the year 1767"। এই প্রস্তাবনার কারণ, আমাদের ভাবা দরকার ১৭৫৭ সালের জয়ের তিন বছর পর ব্রিটিশ বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার পায়, প্রায় ষাট বছর লাগে তাদের বাকি ভারতে অধিকার কায়েম করতে, অথচ মাত্র দশ বছরের মধ্যেই তারা 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' নামক সংস্থা স্থাপন করে। ভাবতে হবে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কি কারণে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। এর পেছনে দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ সেনার চলাফেরার জন্য ভারতের ভৌগোলিক বিশেষত্ব জানা জরুরি ছিল। বিশেষ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক বিশেষত্ব সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সংস্থা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানচিত্র তৈরী করে যা ব্রিটিশ সেনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ক্রমে এই নিরীক্ষার নানা দিক সামনে আসে। ব্রিটিশদের হাতেই গড়ে ওঠে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মতো সংস্থা। এত ধরণের নিরীক্ষণ সংস্থা গড়ে তোলার কারণ ছিল ভারতের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন যা ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের সাফল্যে সহায়ক হবে।

ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বিপুল ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল। শুরুর দিনে জলপথে ইংল্যান্ড থেকে ভারত পৌঁছতে আড়াই-তিন মাস সময় লাগতো। ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এই সময় কমে পঁচিশ-ত্রিশ দিন হয়, স্বাধীনতার সময় জলপথে মাত্র কুড়ি দিনে এই দূরত্ব অতিক্রম করা যেত। এর সাথে সাথে ইংরেজ ভারতে বেশ কিছু আধুনিক বিজ্ঞানের সুফল নিয়ে আসে। যেমন টেলিগ্রাফের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সে ব্যবস্থা কি ভারতীয়দের সুবিধার জন্য আনা হয়েছিলো? টেলিগ্রাফ এসেছিলো বিভিন্ন অঞ্চলের সেনাবাহিনীর মধ্যে জরুরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। একইভাবে এসেছিলো রেল। মুম্বাইতে রেলপথ চালু হয় ১৮৫৩ সালে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই রেলপথের ব্যবহার কখনোই ভারতীয়দের সুবিধাজনক পরিবহনের উদ্দেশ্যে ছিল না, ছিল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ মুম্বাই বন্দরে সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, যাতে সেই সব সম্পদ মুম্বাই বন্দর থেকে জাহাজপথে ইংল্যান্ডে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পাঠানো যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৫ সালে কলকাতায় প্রথম এলোপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ তৈরী করে, যার প্রধানতম কারণ ছিল ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ সেনাদের আধুনিক চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা। ব্রিটিশদের হাত ধরে যে আধুনিক বিজ্ঞানের সুবিধাগুলি ভারতে এসেছিলো, সেগুলোর কারণ কোনোভাবেই ভারতীয়দের বিকাশ বা কল্যাণ ছিল না। তার পেছনে লুকিয়ে ছিল তাদের রাজত্ব করার সুবিধা ও ভারতের সম্পদ আরো বেশি করে লুট করার উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি দিক আমাদের সামনে আসে। আমরা এখানে শুধু তিনটির কথা আলোচনা করবো। ব্রিটিশরা এখানে নীল চাষের ব্যাপক বিস্তার করেছিল। ১৯১৭ সালে মহাত্মা গান্ধী বিহারের চাম্পারণে যে সত্যাগ্রহ করেছিলেন তাও ছিল নীল চাষ সম্বন্ধিত। সেও এক অবাক করা ইতিহাস। নীল চাষের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিলো চিনি উৎপাদন যা ব্রিটিশ যুগের আগে আমাদের দেশে ততটা ছিল না। আর শুরু হয়েছিল চায়ের চাষ। চিনি উৎপাদনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হতো। ভারতীয়রা কখনোই এই চিনি ব্যবহার করতো না। এদেশে চায়েরও কোনো প্রচলন ছিল না সে সময়ে। তাহলে এই উৎপাদন কিসের জন্য? অবশ্যই ব্রিটেনের স্বার্থে এগুলি উৎপাদন করা হতো।

নীলের ব্যবহার ছিল কাপড় রং করার জন্য। আধুনিক জিন্সও নীল রঙে সর্বাধিক জনপ্রিয়। তার থেকেই বোঝা যায় ভারতে উৎপন্ন এই নীল বিশ্বে কতটা সমাদৃত ছিল। এখানে নীল চাষ করে ব্রিটিশরা চাষিদের বঞ্চিত করে বিনামূল্যে সেই নীল ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার থেকে রং নির্যাস করতো। মহাত্মা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

ইংরেজ আমাদের দেশীয় কৃষি ব্যবস্থাকেও বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ক্যাশ ক্রপ বা সহজে অর্থলাভের উপযোগী কৃষিজ উপাদানের চাষ তাদেরই চিন্তাধারার ফসল। এই ধরণের চাষে প্রচুর জলের প্রয়োজন ছিল। তাই তারা রুড়কীতে জল প্রযুক্তি বিষয়ক নানা সংস্থা স্থাপন করে। এইসব কৃষি উৎপাদন ব্রিটেনে পাঠানো হতো। এই কারণেই নানারকম বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ শুরু হয়। এর অন্যতম ছিল বন বিজ্ঞান বা forest science। শিল্প বিপ্লবের সাফল্যে বন বিজ্ঞানের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

ইংরেজ বুঝতে পেরেছিলো যে, এই দেশের বিপুল জনসংখ্যার সকলকে তাদের মতো করে গড়ে তোলা অসম্ভব। তাই তারা এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরিতে সচেষ্ট হয় যারা দেশীয় জনতা ও ব্রিটিশদের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারীর কাজ করবে। এই শ্রেণীর লোকেদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে ধীরে ধীরে তাদের চিন্তা-ভাবনা ব্রিটিশদের অনুকূলে প্রবাহিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মেকলে সাহেব বলেছেন, "we have to change their taste - They need to change their opinions - We need to change their morals and ultimately we need to change their intellect also"। সে সময় ক'টি বা ব্রিটিশ ছিল এ দেশে? স্বাধীনতার সময় ১৯৪৭ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি, আর ইংল্যান্ডের মাত্র তিন কোটি। আজ তারা ছ' কোটি, আর আমরা প্রায় ১৪০ কোটিতে পৌঁছে গেছি। সুতরাং এই বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ শুধুমাত্র সৈন্যবলের ভরসায় দীর্ঘদিন নিজেদের শাসনাধীন রাখা ব্রিটিশদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তার বদলে তারা সচেষ্ট হলো ভারতীয়দের চিন্তা-ভাবনা, রুচি ও নীতিবোধ নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে। ইংরেজ জানতো যে ভারতীয়দের নিজস্বতা স্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দিতে পারলেই তারা চিরতরে এই দেশে তাদের শাসন চালিয়ে যেতে পারবে।

১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক সিলের 'এক্সপানশন অফ ইংল্যান্ড' বইতে এক নতুন তত্ত্ব সবার সামনে আসে যার থেকে তাদের মনোভাব লোকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই তত্ত্বানুযায়ী এইসব ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চলকে ব্রিটিশ রাজ্যের উপনিবেশ বলা ঠিক নয়, বরং এগুলি হলো ব্রিটিশ রাজ্যের বর্ধিত অংশ। অর্থাৎ সমগ্র ব্রিটিশ শাসনাধীন ভূখণ্ডই ইংল্যান্ডের অংশ। এইভাবেই তারা ভারতে এক নয়া ইংল্যান্ড বানাবার চেষ্টায় ছিল। তারা চাইতো, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ডের মতো ভারতও সেটেলার কলোনিতে পরিণত হবে, আর ব্রিটিশরা এখানে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলবে। তার জন্য সবথেকে জরুরি ছিল

ভারতীয়দের সমস্ত নিজস্বতা ও জাতীয়তাবোধ ধ্বংস করে দেওয়া। এই পরিকল্পনা থেকেই তারা ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রয়োগ শুরু করে যাতে এইসব নতুন বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতীয়দের প্রভাবিত করা যায়।

ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের আচরণ সবসময়ই ছিল বৈষম্যমূলক, যদিও ভারতীয়দের প্রয়োজন তারা অস্বীকার করতে পারতো না। এই অন্যায় ও বৈষম্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বজায় ছিল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে। ১৮৩৫ সালে দেশে যখন প্রথম মেডিক্যাল কলেজ চালু হয়, সেখানে অন্যতম মেধাবী ছাত্র ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৬৩ সালে কলকাতায় ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর শাখা চালু হলে মহেন্দ্রলাল তার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ওই সময় ভারতে হোমিওপ্যাথির চর্চা শুরু হয়। ইংরেজরা হোমিওপ্যাথিকে খুবই নিচু নজরে দেখতো। একই চিন্তাধারায় বিশ্বাসী মহেন্দ্রলাল ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভায় হোমিওপ্যাথির তীব্র সমালোচনা করেন এবং একে একধরণের ছদ্ম-চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে বর্ণনা করেন। এই কথা ইংরেজদের মনের মতো হওয়ার জন্য অচিরেই তিনি ইংরেজদের প্রিয় হয়ে ওঠেন এবং উনার পসার বাড়তে থাকে। কিন্তু মাত্র চার বছর পরে ওনার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। উনি এক রোগীকে চিকিৎসা করে রোগমুক্ত করতে ব্যর্থ হন, কিন্তু সেই রোগী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ হয়ে ওঠেন। কৌতূহলী মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথির অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ মনের অধিকারী। শুধুমাত্র চিকিৎসাবিদ্যায় নয়, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, ভূবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। প্রায় চার বছর অধ্যয়ন করে তিনি উপলব্ধি করেন হোমিওপ্যাথিও যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞাননির্ভর তত্ত্ব। তিনি তাঁর এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উপলব্ধি ১৮৬৭ সালে ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভায় তুলে ধরেন। এই বিষয়টা ইংরেজদের মনঃপুত হলো না এবং তারা তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ বাতিল করে এবং তাঁর ডাক্তারি বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়। অবাক মহেন্দ্রলাল ভাবতে থাকেন, যাদের কাছ থেকে তিনি যুক্তিবোধ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা শিখলেন আজ তারাই তাঁর যুক্তিবোধের বিরোধী হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র তাদের ধারণার সাথে মতের অমিল হবার জন্য! এমনকি, ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকাতেও মহেন্দ্রলালের প্রবন্ধ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এতে মহেন্দ্রলাল মানসিকভাবে প্রচন্ড ভেঙে পড়েন ও প্রায় এক বছর তাঁর পেশা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মহেন্দ্রলাল থেমে থাকার পাত্র ছিলেন না, তাঁর উদ্যোগে ভারতের প্রথম গবেষণাপত্রিকা 'কলকাতা মেডিক্যাল জার্নাল' প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। এই পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যায় তিনি চরক সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "চিকিৎসকের প্রথম ও প্রধানতম কর্তব্য হলো রোগীকে রোগমুক্ত করা, কোন্ চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করে রোগীর চিকিৎসা হয়েছে সেটা মুখ্য নয়। চিকিৎসককে ভাবতে হবে রোগীর উপশমই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং চিকিৎসার পথও সেই কথা মাথায় রেখেই নির্ধারিত হবে।"

সেই সময়েই মহেন্দ্রলাল সংকল্প করেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অগ্রগতির জন্য এমন এক সংস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে ভারতীয়রা স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানচর্চা করতে পারবে, এবং ভারতীয়রা নিজেদের উদ্যোগেই এই সংস্থা গড়ে তুলবে। মহেন্দ্রলালের এই স্বপ্নকে সার্থক করতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহীষী, এমনকি শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্যন্ত তাঁর পাশে দাঁড়ান। এঁরা সকলেই বিভিন্ন সময়ে মহেন্দ্রলালের চিকিৎসাধীন ছিলেন। ত্রিপুরার

ডঃ প্রমথনাথ বোস

মহারাজা ও আরো অনেকে বাড়িয়ে দেন আর্থিক সহায়তার হাত। ১৮৭৬ সালে স্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সাইন্সেস (আইএসিএস)। ভাববার বিষয়, যেখানে ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৮৫ সালে, তার বহু আগেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের ভাবধারা ফুটে উঠেছিল, স্থাপিত হয়েছিল ভারতীয়দের উদ্যোগে ভারতীয়দের নিজস্ব বিজ্ঞান সাধনার সংস্থা।

১৯০৪ সালে মহেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর এই সংস্থার সভাপতি হন স্যার আশুতোষ মুখার্জী। তাঁর আমন্ত্রণে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন এখানে গবেষণা করতে আসেন এবং সেই গবেষণার ফলশ্রুতিতে শুধু ভারতই নয়, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেশীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই সংস্থাও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করে। বলা যায়, এই সংস্থাতেই তৈরী হন আধুনিক ভারতের প্রথম প্রজন্মের বৈজ্ঞানিকরা। আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বা স্যার আশুতোষই নয়, স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানুষও এই সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। এখন থেকেই শুরু হয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বদেশিকতার ঢেউ যা ক্রমে পরবর্তী প্রজন্মের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পরে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বঞ্চনার আরেকটি ঘটনা বৈজ্ঞানিক ডঃ প্রমথনাথ বোসের জীবনের সাথে জড়িত। ইনি ছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার গ্রেডেড সায়েন্টিস্ট পদাধিকারী প্রথম ভারতীয় এবং একজন অসামান্য প্রতিভাধর ভূবিজ্ঞানী। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র ভারতীয় বলেই সংস্থার তৎকালীন মহানির্দেশক মেডলি কাল্টের পছন্দের তালিকায় ছিলেন না। এইধরণের উচ্চপদে একজন যোগ্য ভারতীয়কে কাল্ট কখনোই মেনে নিতে পারে নি। অবসর নেবার সময় কাল্ট সংস্থার মহানির্দেশক পদের জন্য যোগ্যতম প্রার্থী প্রমথনাথকে বঞ্চিত করে তাঁর থেকে দশ বছরের কনিষ্ঠ ও অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন এক ইংরেজকে ওই পদে মনোনীত করে। এই প্রসঙ্গে কাল্টের বক্তব্য ছিল, "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা এখনো চলতেই শিখলো না, তারা দৌড়োবে কিভাবে?" এই ঘটনায় অপমানিত প্রমথনাথ ১৯০৩ সালে এই চাকরিতে ইস্তফা দেন।

অপর একটি ঘটনা। লর্ড র‍্যালে ছিলেন লন্ডন রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি এবং আর্গন আবিষ্কারের জন্য ১৯০৪ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্ববন্দিত বৈজ্ঞানিক। তিনি জগদীশচন্দ্র বোসের নামে একটি শংসাপত্র পাঠান যেতে লেখা ছিল, তাঁর এই মেধাবী ছাত্রটিকে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষকতার সুযোগ দেওয়া উচিত। এর পরও জগদীশচন্দ্রের কলেজে শিক্ষকতার আবেদনপত্রের জবাবে বলা হয় ভারতীয়রা যথেষ্ট যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন নয়, সুতরাং একজন ভারতীয়কে পদার্থবিজ্ঞান পড়ানোর অনুমতি দেওয়া ঠিক নয়। তাঁকে শিক্ষকতার জন্য ইংরেজ শিক্ষকদের সমতুল্য পদ দেওয়া হল না। কিন্তু জগদীশচন্দ্র হার মানার পাত্র ছিলেন না। তিনিও ঘোষণা করেন, তিনি পদার্থবিদ্যা পড়াবেন, কিন্তু ইংরেজদের থেকে বেতন নেবেন না। ১৮৮৪ সাল থেকে তিন বছর তিনি বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেন, পরিশেষে ইংরেজরা হার মেনে তাঁকে পদার্থবিদ্যার শিক্ষকতায় ইম্পেরিয়াল এডুকেশন সার্ভিস (যা এর আগে শুধুমাত্র ইংরেজ শিক্ষকদেরই প্রাপ্য ছিল) পদে স্বীকার করে নেয়, তিন বছরের বকেয়া বেতনও দিয়ে দেয়। ভারতীয় প্রতিভা ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রতি ঘটে চলা অন্যায়, বঞ্চনা ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে এও ছিল এক সত্যাগ্রহ।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের দ্বারা নতুন জ্ঞানের আহরণ – এই কথাটা ব্রিটিশরা কোনোদিন ভারতীয়দের বুঝতে দিতে চায় নি। ফলে সেই সময় জিওলজিক্যাল সার্ভে, বোটানিক্যাল সার্ভে, জুলজিক্যাল সার্ভে, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে, সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সংস্থায় নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হতো ইংলন্ড থেকে, প্রকারান্তরে সে দেশের বৈজ্ঞানিক বিকাশ গতি লাভ করতো। অন্যথায় ভারতীয়দের গবেষণার সুযোগ মিলতো না।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জগদীশচন্দ্র অধ্যাপনার শুরুর দশ বছরের মধ্যে ১৮৯৪ সালে নিজের উদ্যোগে গড়ে তোলেন গবেষণাগার। এ বিষয়ে সরকারিভাবে কোনো আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় নি, সম্পূর্ণ নিজের খরচে তিনি এই গবেষণাগার তৈরী করেন। সেইসময় জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের তত্ত্বের কোনো ব্যবহারিক প্রমাণ ছিল না। জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণাগারে প্রথম মাইক্রো তরঙ্গ (microwave) সৃষ্টি করেন। শুধু ভারত বা এশিয়ায় নয়, এটা ছিল বিশ্বে প্রথম মাইক্রোওয়েভ সৃষ্টির ঘটনা। তিনি এ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে লন্ডন রয়্যাল সোসাইটিতে যান। শোনা যায় সেখানে শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তরুণ ইতালীয় গবেষক মার্কনি। তিনি পরবর্তীকালে এই গবেষণাকাজ এগিয়ে নিয়ে যান ও ১৯০৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আবার বঞ্চনার শিকার হন জগদীশচন্দ্র।

জগদীশচন্দ্র বারবার বলতেন দেশের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ না ঘটলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশ কোনোদিনও সম্মান অর্জন করতে পারবে না। ইংরেজ এই ব্যাপারটাই চিরদিন দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। জগদীশচন্দ্র শুধুমাত্র মাইক্রোওয়েভ বা বায়োফিজিক্সের গবেষণার জনক বলেই বিশ্ববিখ্যাত নন, আজকের দিনে প্ল্যান্ট নিউরোবায়োলজি বলে যে বিষয়ে প্রভূত পঠনপাঠন ও গবেষণা হয়, তারও জনক মানা হয় জগদীশচন্দ্রকে। ক্রোনোবায়োলজি নামে বিজ্ঞানের অপর একটি নতুন শাখার সম্প্রতি উদ্ভাবন হয়েছে, যেখানে নিদ্রামগ্ন অবস্থা বা সার্কাডিয়ান রিদম (circadian rhythm)-এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দেখা যাবে, এই বিষয়েও প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। উদ্ভিদরা কি ঘুমোয়? – এ চিন্তা প্রথম তাঁরই মস্তিস্কপ্রসূত। আজ বিজ্ঞানজগৎ একথা মেনে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেদিন ইংরেজরা প্রানপণ চেষ্টা করেছিল এই অনন্য তত্ত্বকে দাবিয়ে রাখার।

এরপর বলি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা। হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি তাঁর বিখ্যাত রচনা। বিখ্যাত নেচার পত্রিকায় এই বইয়ের অনেক অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। আচার্য এই বই লিখেছিলেন বিশ্বের দরবারে ভারতের আত্মমর্যাদা তুলে ধরার জন্য। কিন্তু আত্মনির্ভরতা বিনা কখনোই আত্মমর্যাদার বিকাশ সম্ভব নয়। তাই এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৯০১ সালে ভারতে শুরু করলেন সম্পূর্ণ স্বদেশী উদ্যোগে তৈরী রসায়ন শিল্প। স্থাপিত হলো বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল।

১৯০৩ সালে পদত্যাগের পর প্রমথনাথ বোস উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের মহারাজার খনিজ সম্পর্কিত কাজে যোগ দেন। সেইসময় তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় জামশেদজি টাটার। ১৯০৭ সালে জামশেদপুরে তৈরী হয় টাটা স্টিল। যদিও ১৯০৪ সালে জামশেদজির মৃত্যু হয়, পরবর্তী সময়ে দোরাবজি টাটা তাঁর এই স্বপ্ন সার্থক করে তোলেন। এই নির্মাণের পেছনে প্রমথনাথের অবদান অনস্বীকার্য, খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ এই শিল্পোপযোগী স্থানটি প্রমথনাথই টাটাকে দেখান।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে বাংলার বুকে নেমে আসে ঘোর সঙ্কট। দেশবাসী একত্রিত হয় এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শুরু হয় বিদেশী দ্রব্যের বর্জন। তার আগেই বিজ্ঞানীরা দেশকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র টাটার সাথে দেখা করেন। আলোচনা হয়, লোহা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সালফিউরিক এসিডের উৎপাদন আমাদের দেশে যথেষ্ট নয়। বিশ্বে ক্রমবর্ধমান লৌহশিল্পের চাহিদা পূরণ করতে তখন কোনো দেশের অর্থনীতিতে সালফিউরিক এসিডের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশী উদ্যোগে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের পরিকল্পনা করেন।

এইরকমই ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা যা তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও ছড়িয়ে গিয়েছিলো। এই তালিকায় সামিল ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস, মেঘনাদ সাহা ও আরো অনেকে। ১৯১০ থেকে ১৯৩০ – যে সময়টাকে আমরা ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলে মনে করি, যে সময় ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল, সেই ধারার ধারক ও বাহক ছিলেন এইসব পরবর্তী প্রজন্মের বৈজ্ঞানিকরা। ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্র আইনস্টাইনের নজরে আসে, যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট যা পরবর্তী সময়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নেয়। ১৯১৮ সালে রামন তাঁর গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯৩০ সালে নোবেল লাভ করেন।

এইসব বিজ্ঞানসাধকদের মনে অপরিসীম জাতীয়তাবোধ, দেশভক্তি দেশে বিজ্ঞানের বিকাশের মূল প্রেরণা ছিল। ইংরেজ ভারতে বিজ্ঞান এনেছিল নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য। সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল সীমিত। তাঁর মধ্যেই তাদের পক্ষপাতিত্ব, অন্যায়, বঞ্চনা ও ভারতীয় প্রতিভাকে বিকশিত হতে না দেবার চেষ্টা ছিল অব্যাহত। কিন্তু এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতিই দেশের লোকের মনে জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ বিরোধিতা জাগিয়ে তোলে। আইএসিএস-এর মত বহু সংস্থা গড়ে ওঠে। ১৯০৮ সালে বেঙ্গালুরুতে স্থাপিত হয় 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'। এই সংস্থার স্থাপনে স্বামী বিবেকানন্দ, ও পরবর্তী সময়ে ভগিনী নিবেদিতা, জামশেদজি টাটা ও তাঁর পুত্র দোরাবজি টাটার ভূমিকা বিশেষ স্মরণীয়। মাইসুরের মহারাজা এই সংস্থার জন্য ৩৭৫ একর জমি দান করেন। ১৯১৭ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র স্থাপনা করেন 'বিজ্ঞান মন্দির' যা পরে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নাম পরিচিত হয়।

মহেন্দ্রলাল সরকারের পর আইএসিএস-এর সভাপতি হন ডঃ আশুতোষ মুখার্জী। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্যও ছিলেন। প্রকৃত অর্থে আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানের উচ্চ অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু হয় স্যার আশুতোষের হাত ধরে। তাঁর সময়কালেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স কলেজে চালু হয়। সেখানকার শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সি ভি রামন, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানসাধক।

ভারতের সে যুগের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিকরাও সমৃদ্ধ করেছিলেন ভারতীয় সাহিত্যকে। প্রমথনাথ বোস ভূতত্ত্ব বিষয়ক বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন, যদিও তাঁর তিন খন্ডে রচিত 'এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু সিভিলাইজেশন' এক অনবদ্য সৃষ্টি। এর দ্বিতীয় খন্ডে ভারতে শিল্পোদ্যোগের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৩০ সালে বিভূতি শরণ দত্ত লেখেন 'হিস্ট্রি অফ হিন্দু ম্যাথমেটিক্স'। আচার্য জগদীশচন্দ্র রচিত 'অব্যক্ত' একটি কালোত্তীর্ণ বিজ্ঞান সাহিত্য। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সাধনার কথা এই বইতে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের বিশেষিত সদস্য ছিলেন পন্ডিত মদন মোহন মালব্য। এই কমিশনের রিপোর্টে পন্ডিত মালব্যের অবদান উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্পনীতি ও শিল্পের বিকাশ সম্পর্কিত তত্ত্ব পন্ডিত মালব্যের সৃষ্টি।

পরাধীন ভারতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দিকপাল ব্যক্তিত্বদের স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার কথা আজও সেইভাবে আলোচিত নয়। অথচ দেখতে গেলে যাঁরা স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন তাঁদের তুলনায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিজ্ঞান সাধকদের অবদান কোনমাত্রায় কম নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেমন দেশকে বিদেশীদের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করেছেন, তেমনই এই বিজ্ঞান সাধকরা ভবিষ্যৎ ভারতের বিকাশ ও উন্নয়নের ভিত স্থাপন করেছেন, দিশা দেখিয়েছেন, আমাদের সামনে রেখেছেন – যাকে আমরা বলি vision statement।

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের মহালগ্নে যখন আমরা উৎসবমুখর, আমাদের আরো বেশি করে স্মরণ করতে হবে দেশের এইসব মহান বিজ্ঞান সাধকদের অবদানকে। •

লেখক ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার, মুম্বাই-এর ভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান ভারতীর জাতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক। ইমেল: jayantss66@gmail.com

বাংলা বিজ্ঞান সম্প্রচারের ইতিহাস পরিক্রমা: একটি রূপরেখা

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে এদেশে বাংলা বিজ্ঞান সম্প্রচারের আজ-কাল-এর গল্প একবার ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখে নিলে কেমন হয়? ১৯৪৭ থেকে ২০২১ কালপর্বে কতটা এগোল এদেশে বাংলায় বিজ্ঞানের সম্প্রচার? শুধু কি বিজ্ঞানের কিছু তথ্য জানানো গেল নাকি বিজ্ঞানচেতনার বার্তাও পৌঁছল তথ্য আর তত্ত্বের হাত ধরে? এই সম্প্রচার করল কারা, বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকা নাকি বিজ্ঞান ক্লাব? সরকার নাকি অসরকারি সংগঠন? এসব জরুরি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে এই লেখায়। ভারতের কথার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকলেও এলেখায় মূলত আলোকপাত করা হবে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্প্রচারে।

বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা

উনিশ শতকে বাংলায় বিজ্ঞানের লেখালেখি শুরু হয়েছিল, বিজ্ঞানের পত্রিকা বেরিয়েছিল। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশনারিদের উদ্যোগে বের হয় *দিগদর্শন* পত্রিকা; প্রথাগত বিজ্ঞান পত্রিকা না হলেও সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক লেখা প্রকাশিত হত যার মধ্যে ছিল পদার্থবিজ্ঞান, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান ও রসায়ন। ১৮৩২এ বেরোয় *বিজ্ঞানসেবধি* যার প্রকাশক ছিল সোসাইটি ফর ট্রান্সলেটিং ইউরোপিয়ান সায়েন্সেস; এর সম্পাদনা করতেন এম ডব্লু উলাস্টন এবং গঙ্গানারায়ণ সেন। বিজ্ঞানের নাম নিয়ে এটিই প্রথম বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা। সব পত্রিকার পেছনে মিশনারিদের বা ইউরোপিয়দের অবদান ছিল এমন নয়। ভারতীয়দের উদ্যোগে উনিশ শতকে একের পর এক পত্রিকা বের হতে থাকে তার মধ্যে কয়েকটিতে বিজ্ঞানের লেখা প্রকাশিত হত আবার কয়েকটি ছিল পুরোপুরিই বিজ্ঞানের পত্রিকা। এই বিজ্ঞান পত্রিকার তালিকায় উল্লেখ্য *বিজ্ঞান কৌমুদী* (১৮৬০), *বিজ্ঞান রহস্য* (১৮৭১), *বিজ্ঞান বিকাশ* (১৮৭৩), *অণুবীক্ষণ* (১৮৭৫), *বিজ্ঞান দর্পণ* (১৮৭৬), *বিশ্বকর্মা বা বিজ্ঞান রহস্য* (১৮৮৬), *সাহিত্য ও বিজ্ঞান* (১৮৯২), *বিজ্ঞান* (১৮৯৫) প্রভৃতি। যদি এই সময়ে প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকার চরিত্র নির্ধারণ করতে হয় তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় মূল বিষয় ছিল স্বাস্থ্য এবং কৃষি। স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকার মধ্যে ছিল *চিকিৎসক*, *চিকিৎসা সংগ্রহ*, *চিকিৎসা দর্পণ*, *চিকিৎসাতত্ত্ব*, *চিকিৎসা কল্পদ্রুম*, *চিকিৎসা সম্মিলনী*, *চিকিৎসা লহরী*, *ভিষজ দর্পণ*, *স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান*, *স্বাস্থ্য*, *নব চিকিৎসা বিজ্ঞান* প্রভৃতি; আর কৃষি বিষয়ক পত্রিকার মধ্যে ছিল *কৃষি পদ্ধতি*, *কৃষি গেজেট*, *সচিত্র কৃষিশিক্ষার* মত পত্রিকা। তবে এর বাইরে কিছুটা ব্যতিক্রমী ছিল *গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা* (১৮৮৯)।

বিশ শতকে এই বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশের ধারা আরও পুষ্ট হয়। ১৯১২তে অমৃতলাল সরকার সম্পাদিত *বিজ্ঞান*, ১৯২৪-এ সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত *প্রকৃতি*, 'চিকিৎসা বিষয়ক বিজ্ঞান মাসিক' *চিকিৎসা জগৎ* (১৯২৮), বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ (১৯৩১)-এর *পথ*, 'বিদ্যুৎ, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিকপত্র' *বিজলী* (১৯৩৭) পত্রিকার কথা শুধু উল্লেখ করে চলে যাওয়া যাক স্বাধীনতার পরের অধ্যায়ে।

এক্ষেত্রে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর *জ্ঞান ও বিজ্ঞান*-এর কথা প্রথমেই বলতে হবে যা ১৯৪৮এ শুরু হয়ে আজ অবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে বেরিয়ে চলেছে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র। পরে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য যিনি *জ্ঞান ও বিজ্ঞান* সম্পাদনার ক্ষেত্রে অসামান্য মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৬০এর দশকে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানের পত্রিকা ছিল 'মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক' ত্রৈমাসিক *মানবমন* (১৯৬১), *স্বাস্থ্যদীপিকা* (১৯৬৩), *সার সমাচার* (১৯৬৩), *অঙ্কভাবনা* (১৯৬৫), *বিজ্ঞান বার্তা* (১৯৬৬), *ঈশান* (১৯৬৬), *পরিসংখ্যান* (১৯৬৯), *গবেষণা* (১৯৬৯)। যেটা তাৎপর্যপূর্ণ স্বাধীনতার আগে বিজ্ঞান পত্রিকার মূল ধারা ছিল কৃষি সম্পর্কিত, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বা সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক। আর এই সময় দেখা যাচ্ছে একের পর এক গণিত সম্বন্ধীয় পত্রিকাও বের হচ্ছে। এই ধারায় পরে বেরোয় *ধাঁধা* (১৯৭২) এবং *গণিত জগৎ* (১৯৭৫), পরে যা নাম বদলে হয় *গণিত বার্তা*। সত্তর দশকে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পত্রিকা *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, সংক্ষেপে *বিওবি* (১৯৭৭)-র কথা উল্লেখ করতেই হবে। এই পত্রিকার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল 'বিজ্ঞানকে সমাজমুখী এবং সমাজকে বিজ্ঞানমুখী করা'। বিজ্ঞানবোধকে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার আরও চেষ্টা চলছিল। যেমন ১৯৮০ সালে প্রকাশিত উৎস *মানুষ* (প্রথমে *মানুষ*) পত্রিকার লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানের মেজাজ তৈরি করা। পরের বছর (১৯৮১) তিনটি তিন ধরনের পত্রিকা প্রকাশের সাক্ষী। ছোটদের জন্য *বিজ্ঞান মেলা*, কিশোরদের জন্য *কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান* (যা ছিল সম্ভবত প্রথম বাণিজ্যিক বিজ্ঞান পত্রিকা) এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাবের মুখপত্র *বিজ্ঞান*। পরের বছর পশ্চিমবঙ্গের এক সরকারি সংস্থার উদ্যোগে প্রথম একটি বিজ্ঞান পত্রিকা বের হয়, তবে সেকথা এখানে উল্লেখ না করে সরকারি উদ্যোগের মধ্যে আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়। একই কথা প্রযোজ্য হবে বিজ্ঞান সংগঠনের পত্রিকার ক্ষেত্রেও। একের পর এক পত্রিকার নামোল্লেখ না করে আমরা শুধু বাংলা বিজ্ঞান সম্প্রচারের এক বড় উপাদান বিজ্ঞান পত্রিকার সাম্প্রতিককালের বিষয়গত চরিত্র নির্ধারণ করে এপ্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করতে পারি। বিষয়বিন্যাস অনুসারে চার ধরনের পত্রিকার প্রকাশ এখন লক্ষ্য করা যায়; বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ক, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত, প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি প্রসঙ্গে এবং পরিবেশ সম্পর্কিত।

বাংলা খবরের কাগজে বিজ্ঞানের বিশেষ পাতার মাধ্যমে বিজ্ঞান সম্প্রচারের চেষ্টাও নানান সময়ে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে হয়েছে। একাজে সামিল হয়েছে *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *বর্তমান*, *আজকাল*, *সংবাদ প্রতিদিন*, *কালান্তর*, *গণশক্তি*। সাম্প্রতিককালে বের হচ্ছে ইন্টারনেট মাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা, যার মধ্যে রয়েছে *বিজ্ঞান* আর *সায়েন্টিফিলিয়া*। রয়েছে বাংলায় বিজ্ঞানের ব্লগ।

বিজ্ঞান সংগঠন

বিজ্ঞান সম্প্রচারের জগতে এক বড় কুশীলব বিজ্ঞান সংগঠন। প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞান ক্লাব রূপেই তার আত্মপ্রকাশ। বিজ্ঞান সম্প্রচারে বিজ্ঞান ক্লাবের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ১৯৯১ সালে সেকথা লিখেছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানলেখক তারকমোহন দাস। তাঁর মতে, "গত প্রায় দুই দশক ধরে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সম্পূর্ণ স্বকীয় চেষ্টায় যেসব বিজ্ঞান ক্লাব ও সংগঠন গড়ে উঠেছে – বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় ও বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টিতে তাঁদের মিলিত অবদান বড়ো অল্প নয়। নীচের তলা থেকে বিজ্ঞানকে বোঝার, বিজ্ঞানকে জানবার ও বিজ্ঞানকে আপন করে নেবার এই যে উদ্যোগ, এটাই আমার মনে হয় সব থেকে সার্থক ও সঠিক পন্থা। টেক্সট বুকের মাধ্যমে স্কুল কলেজে যে বিজ্ঞান পড়ানো হয়, তাতে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সবসময় একটা ফাঁক থেকে যায়। সেই ফাঁকটি পূরণ করাই হল বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মূল ভূমিকা। চিন্তায়, মেজাজে ও কাজে বিজ্ঞানকে গ্রহণের জন্য, বিজ্ঞানের সুফলগুলি সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ক্লাবগুলির ভূমিকা সত্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের বুক থেকে অবিজ্ঞানের অন্ধকার যত সহজে এবং যত দ্রুত এঁরা সরিয়ে দিতে সক্ষম, আমাদের আর কোনও মাধ্যমের দ্বারা তা সম্ভব নয়।"

উনিশ শতকে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছিল বললে সত্যের অপলাপ হবে। বরং বলা যায় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিভিন্ন সভা-সমিতিকেন্দ্রিক যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটছিল তাতে যেসব সমিতির অবদান ছিল তার মধ্যে মুক্তচিন্তার দুটো সংগঠন ছিল। ডিরোজিওর অনুগামী *নব্যবঙ্গ*-এর গড়ে তোলা সেই দুটো সংগঠন হল *অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন* এবং *সোসাইটি ফর দ্য অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ*। তাদের উদ্যোগে *জ্ঞানান্বেষণ*-এর মত পত্রিকা বের হত। ডিরোজিওর আহ্বান ছিল গুরুবচন, দৈববচন বা শাস্ত্রবচন বলেই কোনও কিছুকে মেনে না নিয়ে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বিচার করার; তাঁর উপাস্য ছিল যুক্তি আর মুক্তি। আবার বিশ শতকে ১৯২৪ নাগাদ ঢাকায় গড়ে উঠেছিল *বারোজনা* নামে এক গোষ্ঠী যাতে যুক্ত ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই সংগঠনের আড্ডায় বিজ্ঞান নিয়ে শুধু যে আলোচনা হত তাই নয়, এঁরা *বিজ্ঞান পরিচয়* নামে একটা মাসিকপত্রও বের করেছিলেন। এরপরে গড়ে ওঠে *বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ* (১৯৩১), *ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন* (১৯৩৫), *সায়েন্স ক্লাব* (১৯৪০), *অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স অব ইন্ডিয়া* (১৯৪৭)-এর মত সংগঠন। এভাবেই বাংলায় বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে ওঠার শুরু।

স্বাধীনতার পরে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে *বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ* (১৯৪৮)। ষাট-সত্তর দশকে একের পর এক বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে এরাজ্যে। এদের মধ্যে *সায়েন্স ফর চিলড্রেন* (১৯৬৩), *গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইন্সটিটিউট* (১৯৭৩), *দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল* (১৯৭৭) সবিশেষ উল্লেখ্য। সমন্বয়কারী সংগঠন হিসেবে ১৯৮১তে গড়ে ওঠে *ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সায়েন্স ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন*, ১৯৮৯তে প্রতিষ্ঠিত হয় *গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র*, পশ্চিমবঙ্গ (পত্রিকা - *গণবিজ্ঞান বার্তা*)। আশির দশকে নানান বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য কাজ শুরু করে *ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম* (১৯৮৪), *নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন* (১৯৮৬)। রক্তদান, মরণোত্তর নেত্রদান ও দেহদানের লক্ষ্যে আন্দোলনে সামিল হয় *অ্যাসোসিয়েশন অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স* (১৯৮০), *ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাঙ্ক* (১৯৮০) এবং *গণদর্পণ* (প্রতিষ্ঠা ১৯৭৭এ, এই বিষয়ে কাজ শুরু ১৯৮৬তে; পত্রিকা - মুখপত্র *গণদর্পণ*)। যুক্তির পথে যাত্রা করে *ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি* (১৯৮৫, পত্রিকা - *যুক্তিবাদী*, *একুশ শতকের যুক্তিবাদী*, *কিশোর যুক্তিবাদী*), হাতেকলমে বিজ্ঞান শিক্ষার কাজ শুরু করে *সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরাম* (১৯৮৫), পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতা তুলে ধরে *অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ফোরাম* (১৯৮৫)। রাজনৈতিক দলের গণসংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে *পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ* [১৯৮৬,পত্রিকা - প্রথমে *জনবিজ্ঞান* (১৯৮৮), পরে *জনবিজ্ঞানের ইস্তাহার*; এবং *কিশোর বিজ্ঞানী* (১৯৮৯), পরে *এযুগের কিশোর বিজ্ঞানী*], *ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটি* (১৯৯৫, পত্রিকা - *প্রকৃতি*)।

এবার আসা যাক সরকারি উদ্যোগের কথায়।

আকাশবাণী কলকাতা

সরকারি উদ্যোগে বিজ্ঞান সম্প্রচারের কথা বলতে গেলে বলতে হয় আকাশবাণী কলকাতার কথা। আকাশবাণী কলকাতার জন্ম ১৯২৭এ। তবে বিজ্ঞান সম্প্রচারের কাজে এর ভূমিকা পালনের শুরু অনেক পরে থেকে। ১৯৩৭এ শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে আকাশবাণী কলকাতা, তিরিশ মিনিটের এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হত সপ্তাহে দুদিন করে। বিজ্ঞানের প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি তাতে থাকত জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বিষয়ও, যেমন টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বিমান, রেল ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য সময়কালে অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বিজ্ঞান সম্প্রচার প্রাথমিকভাবে সীমাবদ্ধ ছিল গ্রাম এবং কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে; অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল *পল্লী মঙ্গল*, *কৃষি জিজ্ঞাসা*, *কৃষিকথার আসর*, *চাষীভাইদের জন্য*। প্রথম বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান ছিল *অন্বেষা* যা ছিল পাক্ষিক অনুষ্ঠান। আসলে ১৯৭৬ সালে সংঘের (ইউনিয়ন) সরকার দেশের সাতটা বিজ্ঞান কেন্দ্রে বিজ্ঞান বিভাগ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেয় যার মধ্যে কলকাতা ছিল পূর্ব ভারতের একমাত্র কেন্দ্র। ছিয়াত্তরেই শুরু হয় বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা যাতে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন বিজ্ঞান সম্প্রচারকেরা যাদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা। ১৯৭৭ সালে আকাশবাণী কলকাতার বিজ্ঞান বিভাগ গড়ে উঠলে ঠিক হয় সপ্তাহে সাড়ে তিন ঘণ্টা বিজ্ঞানের

অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রাথমিক পর্বে এই কাজ পরিচালনায় যাঁদের নাম উল্লেখ্য তাঁরা হলেন অমিত চক্রবর্তী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণা ঘোষাল। আগে উল্লেখিত অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল *জ্ঞান বিজ্ঞানের আসর*, *বিজ্ঞান বিচিত্রার* মত অনুষ্ঠান। পরে গড়ে উঠেছিল *রেডিও সায়েন্স ক্লাব*-এর মত সংগঠন যারা বিজ্ঞান সম্প্রচারে মানুষকে উৎসাহী করত। আশির দশকে **ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন (এন সি এস টি সি)** তৈরি হওয়ার পর আকাশবাণী তার অর্থানুকূল্যে বেশ কিছু বিজ্ঞান ধারাবাহিক সম্প্রচারিত করে। এর মধ্যে উল্লেখ্য *বিজ্ঞানের নিয়ম কানুন*, *বিবর্তনের পথে মানুষ*, *সন্ধিক্ষণ* ইত্যাদি। পরে **বিজ্ঞান প্রসার**-এর সহযোগিতাতেও এই ধরনের বিজ্ঞান ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমাদের এই *বসুন্ধরা*, *লণ্ঠন থেকে লেজার*। ১৯৯৬তে আকাশবাণী কলকাতার এফ এম চ্যানেলে শুরু হয় *বিজ্ঞান রসিকের দরবারে* শীর্ষক ফোন-ইন অনুষ্ঠান যা আকাশবাণীর বিজ্ঞান সম্প্রচারকে এক অন্য মাত্রা দেয়। শুধু এই অনুষ্ঠান করাই নয়, এই পর্বে আকাশবাণীর বিজ্ঞান সম্প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নেন মানসপ্রতিম দাস; যে কাজের স্বীকৃতি মেলে তাঁর পাওয়া বিভিন্ন পুরস্কারে। রেডিওর নিয়মিত অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে জানা *অজানা*, *অন্বেষা*, *বিজ্ঞান: ঘরে বাইরে* ।

আকাশবাণীর সঙ্গে শুধু একথা উল্লেখ করা থাক যে দূরদর্শনেও বিজ্ঞান সম্প্রচারের চেষ্টা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য জাতীয় কার্যক্রমে সমর বাগচি প্রমুখের নেতৃত্বে বিজ্ঞানের হাতে-কলমে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা *কোয়েস্ট* আর কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠান *বিজ্ঞান প্রসঙ্গে*।

বিড়লা মিউজিয়াম (১৯৫৯) থেকে এন সি এস এম (১৯৭৮)

'বিজ্ঞান পড়লে মনে থাকে না, দেখলে মনে থাকে আর ক'রে দেখলে তা বুঝে যাওয়া যায়', মধ্যপ্রদেশের এক বিজ্ঞানশিক্ষা উদ্যোগের এই স্লোগানকে মনে রেখে বলা যায় বিজ্ঞান সম্প্রচারের ক্ষেত্রেও হাতে-কলমে কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ যে-কাজে মুখ্য ভূমিকা নেয় বিজ্ঞান সংগ্রহশালা। ভারতে প্রথম বিজ্ঞান সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে কলকাতায় ১৯৫৯সালে। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা বা বিড়লা মিউজিয়াম এদেশে বিজ্ঞান সংগ্রহশালাভিত্তিক বিজ্ঞান সম্প্রচারে নেতৃত্ব দিয়েছে। এর হাত ধরেই গড়ে উঠেছে ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী, জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র, অন্য রাজ্যে এমনকি অন্য দেশেও বিজ্ঞান সংগ্রহশালা। পরে ১৯৭৮এ দেশের বিজ্ঞান সংগ্রহশালাগুলো পরিচালনার জন্য গড়ে ওঠে **ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স মিউজিয়াম (এন সি এস এম)**। এরই উদ্যোগে কলকাতায় ১৯৯৭তে গড়ে ওঠে *সায়েন্স সিটি*।

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন (এন সি এস টি সি)

১৯৮২তে গড়ে ওঠে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন (এন সি এস টি সি)। এর লক্ষ্য বিজ্ঞান সম্প্রচার এবং বিজ্ঞানের মেজাজ তৈরি। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য এন সি এস টি সি বিজ্ঞান সম্প্রচারে যুক্ত ব্যক্তি ও সংস্থার এক বড় মঞ্চ হয়ে উঠতে চেয়েছে। একাজে তার সবচেয়ে বড় দুটো উদ্যোগ ছিল ১৯৮৭তে *ভারত জন বিজ্ঞান জাঠা* এবং ১৯৯২তে *ভারত জন জ্ঞান বিজ্ঞান জাঠা*। বিজ্ঞান সম্প্রচারের জন্য দেশ জোড়া এই দীর্ঘ যাত্রার অভিনবত্ব শুধু অংশগ্রহণকারীর সংখ্যায় বা ভৌগোলিক বিস্তৃতিতেই ছিল না, ছিল বিজ্ঞান সম্প্রচারে বৈচিত্র্যপূর্ণ মাধ্যমের ব্যবহারেও যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন লোকমাধ্যম যেমন লোকগান, পুতুলনাচ, পথনাটিকা ইত্যাদি। ১৯৮৭এর জাঠার ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে *অল ইন্ডিয়া পিপলস সায়েন্স নেটওয়ার্ক* (এ আই পি এস এন)। মূলত ওই জাঠার জাতীয় সাংগঠনিক কমিটি থেকেই এই সংস্থা গড়ে ওঠে। তবে নতুন সদস্য নেওয়ার ব্যাপারে এর অনীহার জন্যই পরে এন সি এস টি সি নতুন একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কথা ভাবে। এন সি এস টি সি-এর পত্রিকা *এন সি এস টি সি কমিউনিকেশন*-এ অনেক মত বিনিময়ের পরে ১৯৯১তে *এন সি এস টি সি-নেটওয়ার্ক* রেজিস্ট্রার অব সোসাইটিজ-এ এক সংস্থা হিসেবে পঞ্জীকৃত হয়। ৪৩টি সংস্থা নিয়ে এই নেটওয়ার্ক তার যাত্রা শুরু করে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক সংস্থা ছিল যার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য প্রবীণ বিজ্ঞান সংগঠন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৪৮)। ইতিমধ্যে ১৯৯০তে একটি নতুন উদ্যোগ শুরু হয় যার নাম ছিল *মাস অ্যাকশন ফর ন্যাশনাল রিজেনারেশন* (সংক্ষেপে মানর)। বলা হয় জাঠার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এই মানর বা 'জাতীয় জাগরণের জন্য জনতার কাজ' যা কিনা 'মানুষের জন্য বিজ্ঞান' কর্মসূচির এযাবৎ সবচেয়ে বড় উদ্যোগ।

১৯৯৩ থেকে এন সি এস টি সি *জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস* আয়োজন করতে শুরু করে। এটি প্রাথমিক পর্বে হয় রাজ্য ও জেলা স্তরে। ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানচর্চায় উদ্যোগী করতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে একথা বলা যায় যে বিজ্ঞান সম্প্রচারের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছিল।

বিজ্ঞান প্রসার

বিজ্ঞান সম্প্রচারের জগতের এই বিস্তারে বড় ভূমিকা নেয় বিজ্ঞান প্রসার। ১৯৮৯তে বিজ্ঞান প্রসার-এর জন্ম। বিজ্ঞান প্রসারও বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়; গড়ে তোলা হয় *ভিপনেট* বা *বিজ্ঞান প্রসার নেটওয়ার্ক অব সায়েন্স ক্লাবস*। বিজ্ঞান সম্প্রচারের লক্ষ্যে এই সংস্থা বিজ্ঞানের বইপত্র প্রকাশ করে, গড়ে তোলে বিজ্ঞান প্রচারের বিভিন্ন উপকরণ। *বিজ্ঞান প্রসার ইনফরমেশন সিস্টেম* বা *ভিপরিসও* আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। বিজ্ঞান প্রসারের দ্বিভাষিক হিন্দি ও ইংরেজি পত্রিকা *ড্রিম ২০৪৭* তো ছিলই; সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান প্রসার দেশের বিভিন্ন ভাষায় বিজ্ঞান সম্প্রচার করতে বেশি করে উদ্যোগী হয়েছে; নানান ভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত *বিজ্ঞান কথা* (২০২০)।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ

শুধু যে সংঘের সরকারের উদ্যোগে বিজ্ঞান সম্প্রচার চলছিল তা নয়, রাজ্য সরকারের কিছু উদ্যোগের কথাও বলা যায়। ১৯৮২ সালে **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ** থেকে বের হয় প্রথম সরকারি বিজ্ঞান পত্রিকা *বিজ্ঞান জগৎ*, পরে নাম বদলে যা হয় *আমদের বিজ্ঞান জগৎ*। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি তৈরি হলে কমিটি প্রকাশ করে *ত্রৈমাসিক মুখপত্র* (১৯৮৭) নামক বিজ্ঞান পত্রিকা। নামে ত্রৈমাসিক হলেও এই পত্রিকা কখনই নিয়ম করে বেরোয় নি। ত্রৈমাসিক মুখপত্রে থাকত 'সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞান' শীর্ষক এক বিভাগ যাতে মানুষের সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পথ নির্দেশ করা হত। ১৯৮৮তে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর গঠিত হয়। পঞ্চম সংখ্যা থেকে ত্রৈমাসিক মুখপত্র পত্রিকার নাম বদলে হয় *বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও প্রগতি* (১৯৯০-১৯৯১ সংখ্যা)।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু হয় রাজ্য *বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস*। এর দুটো দিক উল্লেখযোগ্য; বাংলা ভাষার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফল উপস্থাপন আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিজ্ঞান সংগঠনের গবেষকদেরও গবেষণানিবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া। রাজ্য সরকার ১৯৯৫ সালে চালু করে *মেঘনাদ পুরস্কার* যা প্রদান করা হয় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করায় কৃতিত্ব দেখানো বিজ্ঞান সংগঠনকে।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে বাংলায় বিজ্ঞান সম্প্রচারের এই ইতিহাস-পরিক্রমাতে যত কথা বলা হল তত কথা না বলাও রয়ে গেল। সীমিত পরিসরে সব তো আর বলা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান সম্প্রচারে বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা অনালোচিত থেকে গেল। সংস্থার ক্ষেত্রেও খুব কম নামই উল্লেখিত হয়েছে, লেখক তার জন্য দুঃখিত। তবে এই চুম্বক-আলোচনাতেও একথা বোঝা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলা বিজ্ঞান সম্প্রচার পরিমাণগত এবং গুণগত – দু'দিক থেকেই সমৃদ্ধ হয়েছে। •

লেখক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক।
ইমেল: sabya4@klyuniv.ac.in

পরাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণায় স্যার আশুতোষের অবদান

সত্যবাচী সর

ভারতের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনায় প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর পর্বে নানা মনীষীর অবদানের কথা এসে পড়ে। এ প্রসঙ্গে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আশুতোষ ছিলেন অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন এক তেজদীপ্ত কর্মবীর ও দক্ষ প্রশাসক। সর্বত্র ছিল তার প্রতিভার স্বাক্ষর ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। প্রধানত বিদগ্ধ আইনজীবি ও বিশিষ্ট বিচারক, অনন্য শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার শীর্ষ স্থপতি হিসাবে তার পরিচিতি হলেও তিনি ছিলেন গণিতপ্রেমী ও গণিতজ্ঞ, মাতৃভাষাপ্রেমী ও বিজ্ঞানের প্রসারে নিবেদিত প্রাণ। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী, তাঁর কর্মই অন্যের অনুপ্রেরণা। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ আশুতোষ পরাধীন ভারতকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছেন।

এখানে মূলত উচ্চশিক্ষার বিকাশে ও বিজ্ঞান গবেষণায় গতি সঞ্চারে আশুতোষের অবদানের কথা আলোচনা করা হবে। তবে তা ঠিক মতো অনুধাবন করতে প্রথমে সংক্ষেপে তার জীবনী নিয়ে দু-চার কথা আলোচনা করে নেব।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৮৮৯) এবং জগত্তারিণী দেবীর (১৮৪৮-১৯১৪) জেষ্ঠ সন্তান আশুতোষের জন্ম ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বৌবাজারের মালাঙ্গা লেনের ভাড়াবাড়িতে। কিছুটা বিভ্রান্তি থাকলেও তার জন্মদিন সর্বত্র ২৯শে জুন পালন করা হয়। গঙ্গাপ্রসাদ শুধু খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন না, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন অগ্রপথিক। চিকিৎসাবিদ্যার উপর তাঁর লেখা কয়েকটি বই আছে। জগত্তারিণী দেবী ছিলেন ভক্তিমতী নিষ্ঠাপরায়ণা দৃঢ় চরিত্রের এক সাহসিনী রমণী। আশুতোষের পড়াশুনো শুরু হয় বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছে। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী আশুতোষকে কোনোকিছু একবার বলে দিলে তা তাঁর স্মৃতিতে চিরকালের মতো গেঁথে থাকত। আশুতোষের প্রতিভার সম্যক উন্মেষ ও চরিত্রগঠনের দিকে সব সময় গঙ্গাপ্রসাদের তীক্ষ্ম নজর ছিল। পিতার যত্ন, পরিচর্যা, পরামর্শ, প্রশয়, স্নেহ ও অনুশাসনে আশুতোষের প্রতিভার ও চরিত্রের বিকাশ সুদৃঢ় ও সার্থক হয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আশুতোষকে কালীঘাট সুবার্বান স্কুলে ভর্তি করা হয়। তিনি ক্লাসে সবসময় প্রথম হতেন। ছোট বয়স থেকে গণিতের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ভালোবাসা থাকলেও অন্য বিষয় তার সমান মনোযোগ ছিল। তিনি ছিলেন গণিতের বিস্ময় প্রতিভা (mathematical prodigy)। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার আগে তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির অনুশীলনীর ৩৪৮ সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। বর্তমানে এই পাণ্ডুলিপি কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরির 'আশুতোষ সংগ্রহশালায়' সংরক্ষিত।

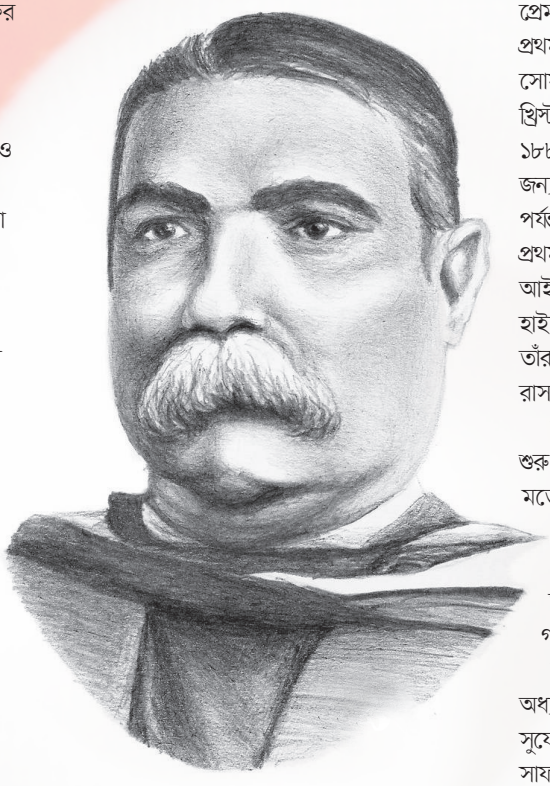

পনেরো বছর বয়সে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এফ.এ. পরীক্ষার আগে শারীরিক অসুস্থতাকে আমল না দিয়ে তিনি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে অস্বাভাবিক মানসিক জোরকে সম্বল করে পরীক্ষায় বসেন এবং এফ.এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। লাভ করেন ইশোন ও ভিজিয়ানাগ্রাম বৃত্তি এবং হরিশচন্দ্র পুরস্কার। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি গণিতে এম.এ. পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান দখল করেন।

আশুতোষের অসামান্য সাফল্যের প্রশংসা পাওয়া যায় পরবর্তী সময়ের তিনজন উপাচার্যের সমাবর্ত ভাষণে (১৮৮৪ সালে এইচ বি রোনাল্ডসের, ১৮৮৫ সালে সি পি ইলবার্টের, ১৮৯০ সালে প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের)। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আশুতোষ পদার্থবিদ্যায় এম.এ. ডিগ্রি করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাধিক বিষয়ে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করার প্রথম ব্যক্তির কৃতিত্ব অর্জন করেন। একই বছরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানীয় প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি অর্জন করেন। তিনি আবার প্রথম ভারতীয় হিসাবে লন্ডন ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেন ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময় আশুতোষ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সিটি কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত পরপর তিন বছর তিনি আইন পরীক্ষায় প্রথম হয়ে জে এম ঠাকুর স্বর্ণপদক লাভ করেন। আইনের স্নাতক হয়ে ১৮৮৮ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে উকিল হিসাবে যোগ দেন। সেখানে তাঁর সিনিয়র ছিলেন প্রখ্যাত আইনবিদ স্যার রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১)।

আশুতোষ গণিত গবেষণা দিয়ে তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন যখন ভারতে গবেষণা কি তা ঠিক মতো জানা ছিল না। এফ.এ. পড়ার সময় তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র, বি.এ. পড়ার সময় তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্র এবং এম.এ. পড়ার সময় তার তৃতীয় গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তিনটি গবেষণাপত্রই বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়।

আশুতোষ চেয়েছিলেন গণিতের গবেষক অধ্যাপক (Research Professor) হতে। সুযোগও এসেছিল। এম.এ. পরীক্ষায় আশুতোষের সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে ডি পি আই আলফ্রেড ক্রফ্‌ট আশুতোষকে ডেকে পাঠিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কথা বলেন। চাকরি গ্রহণ করার জন্য আশুতোষ দুটি শর্ত রাখেন। প্রথম শর্ত হল তাঁকে বদলি করা যাবে না, দ্বিতীয়টি হল ইউরোপীয় অধ্যাপকের সমান পদমর্যাদা ও মাইনে দিতে হবে। ক্রফ্‌ট প্রথম শর্ত মানলেও দ্বিতীয়টিকে অসম্ভব দাবি মনে করেন। তখন দেশপ্রেমীক ও আত্মসম্মানজ্ঞানী আশুতোষ ক্রফ্‌টকে ধন্যবাদ জানিয়ে চাকরি গ্রহণে অসম্মতির কথা জানিয়ে দেন। তিনি আইনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। আগেই বলা হয়েছে তিনি ১৮৮৮ সালে কলকাতা হাইকোর্টের উকিল হিসাবে যোগদান করেন। আইনকে পেশা হিসাবে

গ্রহণ করেও তিনি আইনের পড়াশুনো অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি আইনে অনার্স ডিগ্রি পান এবং ১৮৯৪ সালে তিনি 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রি লাভ করেন। তাছাড়া ১৮৯৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি সম্মানীয় 'টেগোর ল প্রফেসর'-এর পদ অলংকৃত করেন। আইনের সেবায় তাঁর অফুরান কর্মশক্তি, গভীর অনুরক্তি, বিশাল পান্ডিত্য এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিষ্ঠা ও বিদগ্ধতার নিষ্ঠা আশুতোষকে আইনের ক্ষেত্রে অতি বিশিষ্ট করে তুলেছিল। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি থেকে অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত বিচারপতির কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

মাঝখানে ১৯২০ সালে ছয়মাসের জন্য তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। এই দীর্ঘ কার্যকালে তিনি দুহাজার পাঁচশোর মতো মামলার রায় দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে বহু ঐতিহাসিক রায় আছে। 'ল জার্নালে' তাঁর সব রায় নথিভুক্ত আছে।

আইনের জগতের গুরুদায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ নিজেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে যুক্ত রেখেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য এবং একই বছর সিন্ডিকেটের সদস্য পদ লাভ করেন, যা তার বাকি জীবনেও বজায় ছিল। ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হয়ে পরপর চার দফায় এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। পরে আর এক দফায় (১৯২১-১৯২৩ সাল) উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। কেবলমাত্র ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আটমাস (পয়লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে অগাস্ট পর্যন্ত) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশন ছাড়া তিনি একই সঙ্গে বিচারপতি ও উপাচার্যের কাজ অত্যন্ত দক্ষতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব সম্মানিকভাবে (honorary) পালন করেও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন এক মহান উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন যা অন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছে ছিল সাধ্যাতীত।

তাঁর পরিচালনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ না থেকে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার উৎকর্ষকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইংরেজদের তৈরি শিক্ষা পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন নিজের পরিকল্পনা মতো। সত্যি, 'উচ্চ শিক্ষার রাজ্যপাটে আশুতোষ ছিলেন প্রধান ঋত্বিক'।

কর্মভার থেকে অবসর নেবার পর দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার ব্রত উদযাপনের জন্য আশুতোষ বেশিদিন সময় পান

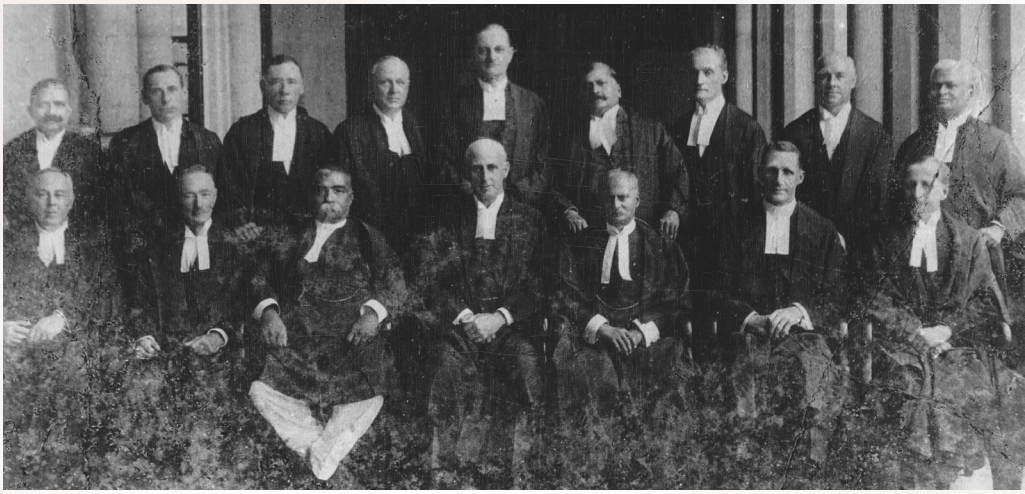

নি। হঠাৎ ১৯২৪ সালের ২৫শে মে পাটনায় তাঁর অকালপ্রয়াণ ঘটে।

আশুতোষের গবেষক-অধ্যাপক হবার ইচ্ছা পূরণের আর এক চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। যখন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে (১৮৯০-১৮৯২) কার্যভার গ্রহণ করলেন, তখন তিনি গণিতের এক অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করে করে আশুতোষকে নিয়োগ করার প্রবল চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হতে পারেন নি। ফলে আশুতোষকে গণিত গবেষণা ছেড়ে আইনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। পেশাগত ভাবে গণিত গবেষণা না করলেও আশুতোষ ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গণিত গবেষণা চালু রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর গণিত গবেষণা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আগে উল্লিখিত তিনটি গবেষণাপত্র ছাড়া আশুতোষের আরো তেরোটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। লন্ডনের *Educational Times* শীর্ষক জার্নালে ৮০টি প্রশ্ন ও ১৫৫টি প্রশ্নের সমাধান প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা দুটি উচ্চমানের পাঠ্যবই (*The Elementary Treatise of Conics* এবং *Arithmetic for Schools*) প্রকাশিত হয়।

আশুতোষ গণিতে অবদান রাখার সুযোগ না পাওয়ায় আই-এ-সি-এস বা ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪), নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী সি ভি রামন (১৮৮৮-১৯৭০) এবং ভারতের প্রথম সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার আর পি পরাঞ্জপে (১৮৭৬-১৯৬৬) তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 'Asutosh the great mathematician drifting to legal profession'-এর জন্য মহেন্দ্রলাল সরকার হতাশ। রামনের মতে 'Bengal gaining a distinguished judge and a great Vice-Chancellor lost in him (Asutosh) a still great mathematician.' আর পরাঞ্জপের ধারণায় গণিতের অধ্যয়নে ও গবেষণায় আশুতোষ নিযুক্ত থাকলে 'নিশ্চয়ই তিনি জগতের অগ্রণী গণিতজ্ঞদের প্রথম সারিতে থাকতেন।' কিন্তু প্রশ্ন হল – যদি আশুতোষ শুধু গবেষণা-অধ্যাপনায় ব্যপৃত থাকতেন, তাহলে কি পরাধীন ভারতে আশুতোষের নেতৃত্বে উচ্চশিক্ষার বিকাশ ও প্রসার যে ভাবে সংগঠিত হয়েছিল, তা সম্ভব হত? এর উত্তর অবশ্যই – না। উল্লেখ্য, আশুতোষের দ্বারা ক্রফটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিন্তু খুশি। তাঁর আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন, 'সরকারি কর্মচারী হিসাবে তাঁহার (আশুতোষের) স্বাধীনতা প্রথম হইতে সংকুচিত হইত এবং প্রতিভার বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ মিলিত না। পরবর্তী জীবনে তিনি যে পৌরুষ ও তেজস্বীতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইত। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতেছে, তাহা ভবিষ্যতের স্বপ্নে পর্যবসিত হইত। বিজ্ঞান কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট্য পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগ, এ সমস্ত সম্ভবপর হইতো না।' যথার্থই আশুতোষ আত্মসচেতনভাবে নিজের মেধা ও প্রজ্ঞা নিয়োজিত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন করেছেন। আর নালন্দা, তক্ষশীলার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ধারণা এদেশে ছিল না। স্বাধীন দেশে যাই-ই ঘটুক না কেন, পরাধীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হলেও সে আমলে প্রকৃত অবয়ব দান করেছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৪ সালে যদি আশুতোষ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর না স্থাপন করতেন, তাহলে 'ভারতের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস পুরোপুরি ভিন্ন সুর ও ছন্দে রচিত হত।'

স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কমিশনের (১৯১৭-১৯১৯) গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন আশুতোষ। 'The majority of recommendations of this commission represented the views and opinions of Sir Asutosh.' ডালহৌসির চেষ্টায় ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হলেও ব্রিটিশরা শুধু চেয়েছিল ভারতীয়দের এমন শিক্ষা দিতে যাতে তারা শুধু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় উপযুক্ত হয়; যথার্থ শিক্ষিত করতে চায় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা করে গেছে। আশুতোষের লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা ও শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

আশুতোষ ১৯২২ সালে সিনেটে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'Freedom first, freedom second and freedom always, nothing else will satisfy me'. একটি পূর্ণ পরাধীন দেশে স্বাধীনতাস্পৃহা নিয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন আশুতোষ। কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাকে ব্যর্থ মনোরথ করতে পারেনি। আশুতোষ যখন উপাচার্যের পদ প্রথম গ্রহণ করলেন, তখন বিশাল সেনেট হল ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নিজস্ব বাড়ি ছিল না। কোনো গ্রন্থাগার ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী সংখ্যা ছিল নগন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শুধুমাত্র পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্র। আশুতোষের আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয় জাতির সেবায় নিবেদিত এক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন কর্মসূচি গৃহীত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত স্নাতকোত্তর স্তরে গঠন ও গবেষণার ক্ষেত্র ও বিষয় নির্ণীত হয়। শেষ পর্যায়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ ও গবেষণা কর্মসূচী সংহত ও বাস্তবায়িত করা হয়। মনে রাখতে হবে আশুতোষ যখন ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত উপাচার্য ছিলেন না, তখনও 'his policy and plan to build up infrastructure and promote orientation for Post Graduate teaching and research was still under his control.'

উল্লেখ্য, ১৯০৮ সালে এম.এ. পাঠরত ছাত্র সংখ্যা ১৯ ছিল, তা বেড়ে ১৯১৫-১৯১৬ সালে হয় ১১৭২। আশুতোষের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও আন্তরিক প্রচেষ্টা তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষের মতো মহান ব্যক্তিদের ও আরো অনেককে উৎসাহিত করেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দ্বিধায় অর্থদান করতে। এসব দানের মোট মূল্য তখনকার দিনে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এই অর্থের দ্বারা নির্মিত হয় দ্বারভাঙ্গা ভবন, বিজ্ঞান কলেজ, গড়ে উঠেছিল নানা বিভাগ, সৃষ্টি হয়েছিল অধ্যাপকের বহু পদ।

প্রতিভা চিহ্নিত করা ও খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী আশুতোষ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি ভি রমন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, গনেশ প্রসাদ, ইয়ং, কালিস, ব্রুল, কিমুরা প্রভৃতি দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে বসিয়েছেন। বিদেশের বহু খ্যাতিমানকে (ম্যাকডোনাল, সিলভাঁ লেভি, গিলবার্ট ওয়াকার, ফোরসিথ, থিবো, ওল্ডেনবার্গ প্রভৃতি) নিয়ে এসে তাঁদের নিজ নিজ গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করেছেন। সত্যি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হল, 'A lasting moment to strenuous labours of a life nobly lived.'

পরাধীন ভারতে বিজ্ঞান তথা গণিতের চর্চা, বিকাশ ও প্রসারে আশুতোষের অবদান প্রসঙ্গে 'আই-এ-সি-এস'-এর সঙ্গে তাঁর সংযোগ, 'সি-এম-এস'-এর (ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা আলোচনা করতে হয়।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আই-এ-সি-এস প্রতিষ্ঠিত হল। উদ্দেশ্য 'to initiate a science movement through an organization where modern scientific research and teaching would be practiced, cultivated and pursued

by Indian Scientists.' আশুতোষ যখন ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ফাদার লাফোঁর বক্তৃতা শুনতে গেছেন।

'বৌদ্ধিক অনুপ্রেরণা অর্জনের জন্য আশুতোষ আই-এ-সি-এস আন্দোলনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। ... তিনি আই-এ-সি-এস-এ বক্তৃতা দিয়ে ও অন্যান্য সহযোগিতা করে সেই ঋণ শোধ করেছেন।' তিনি সাম্মানিক অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে ১৮৮৭ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত মোট ১২৫ টি বক্তৃতা দিয়েছেন – গাণিতিক পদার্থবিদ্যা ও গণিতের বিভিন্ন শাখার উপর। তাছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িত থেকে কাজ করে গেছেন। ১৯০৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মনে রাখতে হবে, 'Working experience in teaching and research in IACS shaped his (Asutosh's) vision of science education in India.'

আধুনিককালে ভারতে গণিতের বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আই-এম-এস (ইন্ডিয়ান ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি) এবং সি-এম-এস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯০৭ সালে 'দি অ্যানালাইটিক্যাল ক্লাব' নামক প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ১৯১০ সালে 'আই-এম-এস'-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯০৮ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সি-এম-এস প্রতিষ্ঠিত হয় 'to create Indian school of mathematics, free from the British authoritarian control, to promote and encourage indigenous mathematical research.'

বিভিন্ন গবেষণাপত্র সংগ্রহ সহ জার্নালের মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। সংস্থার প্রথম জার্নাল 'বুলেটিন অব ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আশুতোষ সংস্থার সভাপতির পদ আমৃত্যু অলংকৃত করেন। সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গাণিতিক বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণাকে উৎসাহ দান, গাণিতিক বিজ্ঞানের বিকাশ, গবেষক ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি। সেই সময় বুলেটিনে প্রকাশিত গবেষণা পত্রগুলি দেখলে বোঝা যাবে সে সময়ের দেশ-বিদেশের বিখ্যাত গণিতবিদদের প্রায় সকলের লেখাই বুলেটিনে প্রকাশিত। লেখকদের তালিকায় আছেন সি ই কালিস, শ্যামাদাস মুখ্যোপাধ্যায়, ডব্লু এইচ ইয়ং, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গনেশ প্রসাদ, সি ভি রমন, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, মেঘনাদ সাহা, নিখিল রঞ্জন সেন প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া সংস্থায় বিভিন্ন সময় গনেশ প্রসাদ, এ আর ফোরসিথ, ডব্লু এইচ ইয়ং-এর মতো প্রখ্যাত গণিতজ্ঞরা বক্তৃতা করেছেন। অনেক তরুণ গবেষক আশুতোষের অনুপ্রেরণায় কাজ করে কৃতিত্বও অর্জন করেছেন।

ইন্ডিয়ান সাইন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন তৈরি হল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম পঁচিশ বছর এর অফিসের ঠিকানা এশিয়াটিক সোসাইটি। উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞানের প্রচার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভিমুখ নির্ণয়, বিশুদ্ধ ও প্রয়োগিক বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি। ১৯১৪ সালে প্রথম সাইন্স কংগ্রেসের অধিবেশন বসল এশিয়াটিক সোসাইটিতে। প্রথম সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সেই কংগ্রেসে একশো পাঁচ জন বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। পড়া হয় মাত্র পঁয়ত্রিশটি গবেষণপত্র। সভাপতির ভাষণে আশুতোষ বলেছেন যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের এক জায়গায় মিলিত হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের মধ্যে অভিমত বিনিময় প্রয়োজন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞান চিন্তার মিলনের প্রয়োজন। আশুতোষ একশো বছর আগে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা না হলে বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই ধারাবাহিক ইতিহাস তৈরি হত না। •

লেখক বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ও বিখ্যাত জনবিজ্ঞান প্রচারক।
ইমেল: satyabachisar@gmail.com

বাংলায় জনবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের ঐতিহ্য

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় আকারে তুলে ধরার প্রয়াস শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে। সেই প্রয়াস আজও অব্যাহত রয়েছে। জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যই ছিল সাধারণ মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ তথা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এই প্রয়াস সংঘটিত ভাবে না হলেও, এর উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। উনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের গোড়ায় নিতান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে কতিপয় উদারচেতা ও সমাজসচেতন ব্যক্তি নিজেদের লেখনীর ওপর ভর করে বিজ্ঞান প্রচারের কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রচার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। আমরা এই প্রবন্ধের মাধ্যমে 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান' প্রচারের ক্রমপর্যায় আলোচনা করার চেষ্টা করবো। আমাদের উদ্দেশ্য হবে বর্তমানকালের জন-বিজ্ঞান প্রসার প্রয়াসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা।

সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমুখী তথা বিজ্ঞানমনস্ক করতে মাতৃভাষার জুড়ি নেই। ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে দুশো বছর আগে ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় এটি অনুধাবন করেছিলেন কিছু শিক্ষিত, সমাজ-সচেতন প্রগতিশীল মনীষী। আর জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রচারে তাঁরা হাতিয়ার করেছিলেন বাংলায় লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক বই ও সাময়িক-পত্রিকাকে। ঘটনাচক্রে বাংলায় লেখা বিজ্ঞানের বই ও পত্রিকার গোড়াপত্তন হয় কিছু ইউরোপীয় পাদ্রী ও ধর্মপ্রচারকের উদ্যোগে। সেটা ১৮০০ সাল। ওই বছর জশুয়া মার্সম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের সহায়তায় উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুরে মিশন ও প্রেস স্থাপন করেন যা পরবর্তীতে বিজ্ঞানের বই প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বাংলায় লেখা বিজ্ঞানের প্রথম বই 'অঙ্কপুস্তকং'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮১৭ সালে। লেখক একজন ব্রিটিশ, নাম রবার্ট মে। আর প্রথম বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'দিগদর্শন' পত্রিকায় ১৮১৮ সালে। এর পরের বছরই (১৮১৯) ঘটে যুগান্তকারী ঘটনাটি। কোনো ভারতীয় তথা বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা বই 'ঔষধ সার সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। বইটির লেখক রামকমল সেন ছিলেন সেই সময়কার একজন সুপণ্ডিত, বাগ্মী ও সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও ফার্সী ভাষায় দক্ষ রামকমল এশিয়াটিক সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি, হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, মেডিকেল কলেজ, এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির মতো নামকরা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বইতে তিনি সাধারণ মানুষের বোঝার উপযোগী করে ৫৬টি ওষুধের নাম, উদ্ভব, প্রয়োগ পদ্ধতি ও উপকারের কথা বর্ণনা করেছেন। জনবিজ্ঞান ভাবনার এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

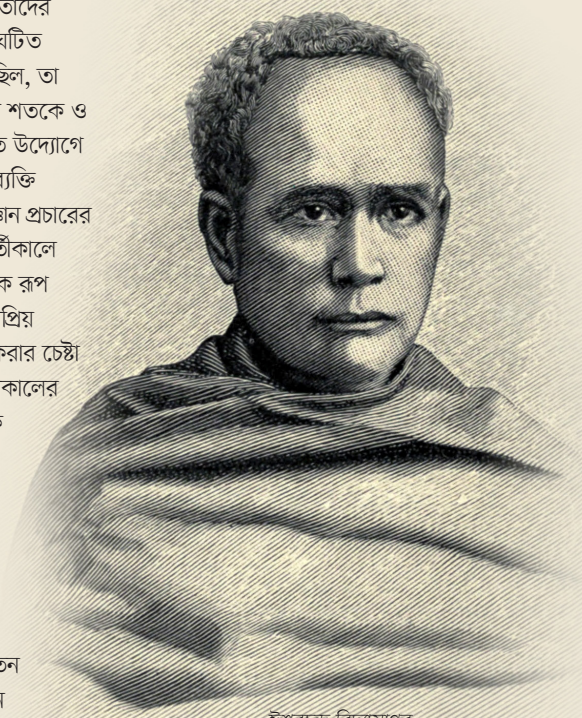

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সেই সময় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পুস্তক প্রণেতাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন ইউরোপীয়। এঁদের মধ্যে জন হারলে (গণিতাঙ্ক, ১৮১৯), ফেলিক্স কেরি (বিদ্যাহারাবলী, ১৮১৯–২০), জন পিয়ারসন (ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথন, ১৮২৪), উইলিয়াম ইয়েটস (পদার্থবিদ্যাসার, ১৮২৪), জন লোশন ও পিয়ার্স (পশ্বাবলী, ১৮২৮), জন ম্যাক (কিমিয়াবিদ্যাসার, ১৮৩৪) ছিলেন অগ্রগণ্য।

এই সময় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন বেশ কিছু বাংলার মনীষী। এঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০–১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২–১৮৯১), প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (১৮২৫–১৮৮৬), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭–১৮৯৪), রামকমল ভট্টাচার্য (১৮৩৪–১৮৬০) অন্যতম। বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইউরোপীয় মিশনারিদের অবদান অস্বীকার করার নয়। কিন্তু তাঁদের রচনাভঙ্গি ও ভাবপ্রকাশ ছিল দুরূহ ও কৃত্রিম। সে তুলনায় বাঙালি, ভারতীয়দের লেখনী অনেকাংশেই ছিল সাবলীল ও বোঝার উপযোগী। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বাংলা ভাষায় রচনা করে বাঙালির বিজ্ঞান মানসিকতার ব্যাপ্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক (১৮৪৩–১৮৫৫ পর্যন্ত) লেখক চূড়ামণি অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ভূগোল' ১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয়। তিনখন্ডে প্রকাশিত 'চারুপাঠ' (১৮৫২–১৮৫৯)-এর বেশিরভাগ রচনাই ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। জড় পদার্থ ও তাঁর সাধারণ ধর্ম নিয়ে এই বইতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাঁর অমর সৃষ্টি 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' একটি কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ। প্রগতিশীল বিজ্ঞান সচেতন অক্ষয়কুমারের সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমুখী করার প্রয়াস স্মরণীয় হয়ে আছে। পরিভাষা সৃষ্টিতেও তিনি অবদান রেখে গেছেন। ভারকেন্দ্র (Centre of gravity), তাড়িত (Electricity), জড়ত্ব (Inertia) শব্দসমূহ তাঁর অমরকীর্তি।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ (বিদ্যাকল্পদ্রুম)-এর রচয়িতা। তেরো কান্ডে (খন্ডে) প্রকাশিত বিদ্যাকল্পদ্রুমে (১৮৪৬–১৮৫১) প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড ছিল জ্যামিতির সম্পাদ্য ও উপপাদ্য এবং বীজগণিতের বিষয়ে (ক্ষেত্রতত্ত্ব)। ভূগোল বিষয়ে আলোচনা রয়েছে তৃতীয় ও অষ্টম কান্ডে।

'প্রকৃত ভূগোল' বইটির লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। বিজ্ঞান পরিভাষায় তাঁর প্রাজ্ঞ অভিমত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বাংলায় 'পাটিগণিত' বা 'বীজগণিত' বইয়ের লেখক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর বিজ্ঞান সম্প্রচারে কম কৃতিত্ব ছিল না। 'শিক্ষাদর্পন', 'সংবাদ এডুকেশন গেজেট' ও 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রিকার সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় লেখেন 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', 'যন্ত্রবিজ্ঞান' ও 'ক্ষেত্রতত্ত্ব'। প্রেসিডেন্সি প্রেস থেকে ১৮৬২ সালে প্রকাশিত রামকমল ভট্টাচার্যের 'জ্যামিতি' ছিল সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান ভাবনা সম্বন্ধে জানলে চমৎকৃত হতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান ভাবনা তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'সৌরোৎপাত', 'আকাশে কত তারা আছে?', 'গগন পর্য্যটন', 'চঞ্চল জগৎ', 'পরিমান রহস্য', 'চন্দ্রলোক' উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিজ্ঞান রহস্য'-এ জায়গা পেয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা একজন সংস্কৃত পন্ডিত, সমাজ সংস্কারক ও দয়ার সাগর বলেই জেনেছি। কিন্তু তিনি যে একজন প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক তথা বিজ্ঞান অনুরাগী ছিলেন সে বিষয়ে আমরা অনেকেই অবগত নই। কারণ তাঁর জীবনের নানা কর্মকান্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলেও, তাঁর চরিত্রের এই দিকটিতে সেভাবে আলোকপাত করা হয় নি। পাঠ্যজীবনে বিদ্যাসাগর বিজ্ঞানচর্চা করেন নি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর আচার-আচরণে একজন সার্থক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের রূপ আমরা দেখতে পাই। তিনি যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্যাদি ও আবিষ্কারের খবরাখবর রাখতেন, তা তাঁর কাজকর্মে প্রমাণিত। বিজ্ঞানের মৌলিক বই তিনি না লিখলেও, ছাত্রদের পঠনের অসুবিধা দূর করার জন্য মেধাবী পন্ডিতমশাই বিজ্ঞানের অঙ্গনে প্রবেশ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। উইলিয়াম ও রবার্ট চেম্বার্স ভাতৃদ্বয় রচিত ইংরেজি বই 'এক্সেম্পলারি বায়োগ্রাফি' থেকে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর জীবনী সংকলন করে 'জীবনচরিত' নামে প্রকাশ (১৮৫০) করেন। যে সমস্ত জীবনী 'জীবনচরিত'-এ স্থান পেয়েছিলো, তাঁরা ছিলেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কৃতবিদ্য ব্যক্তিত্ব। উদ্ভিদবিদ লিনিয়াস, জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস, গ্যালেলিও, পদার্থবিজ্ঞানী নিউটন, ভূগোলবিদ ডুবাল এঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছাত্রদের সুবিধার জন্য বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দের পরিভাষা (ইংরেজি থেকে বাংলা) তৈরী করে 'জীবনচরিত'-এর শেষে যুক্ত করে দিয়েছিলেন, যার কয়েকটি আজও আমরা ব্যবহার করি।

বিদ্যাসাগর প্রণীত বিজ্ঞান-প্রবন্ধ আলোচনা করতে হলে, 'বোধোদয়', চতুর্থভাগের উল্লেখ করতে হয়। প্রধানত 'চেম্বার্স রুডিমেন্টস অফ নলেজ' বইয়ের অনুকরণে 'বোধোদয়' বইটি লেখা। 'বোধোদয়'-এ বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের ওপর লেখা আছে। জড় পদার্থ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ, মানবজাতি, পঞ্চইন্দ্রিয়, ধাতু, কৃষিকর্ম, জল-নদী-সমুদ্র অর্থাৎ প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। বইটির মাধ্যমে জগৎ সম্পর্কে কিশোরদের সম্যক ধারণা গড়ে তোলার প্রয়াস তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যে ছিল। ধাতু কি, সে সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন থালা, বাটি, ঘটি, ছুরি, কাঁচি, পারদ, সোনা, রূপা, হীরা, তামা তিনি লেখায় ব্যবহার করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পর উৎসুক ছাত্ররা বিশদে এদের সম্পর্কে পরে জেনে নেবে। তিনি এইভাবে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য কিশোরদের সামনে তুলে ধরে তাদের বিজ্ঞানচেতনা জাগাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'জীবনচরিত' ও 'বোধোদয়' বই দুটিকে একযোগে বিজ্ঞানের বর্ণপরিচয় ও ধারাপাত বলে মনে করা হয়।

বিদ্যাসাগর ছিলেন সমসাময়িক কালে লেখকদের প্রেরণাস্বরূপ। একদিকে যেমন নানাবিধ গ্রন্থাদি রচনায় পরামর্শ দিতেন, অন্যদিকে আবার তাঁদের গ্রন্থাদি সংশোধনও করে দিতেন। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রণীত পাটিগণিত গ্রন্থে যেমন তিনি শব্দ সংকলনে সাহায্য করেন, বীজগণিত রচনায় উৎসাহিতও করেন। চন্দ্রকান্ত শর্মাকেও তিনি 'গণিতাঙ্কুর' প্রণয়নে উৎসাহিত করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এর সংশোধন করে দেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

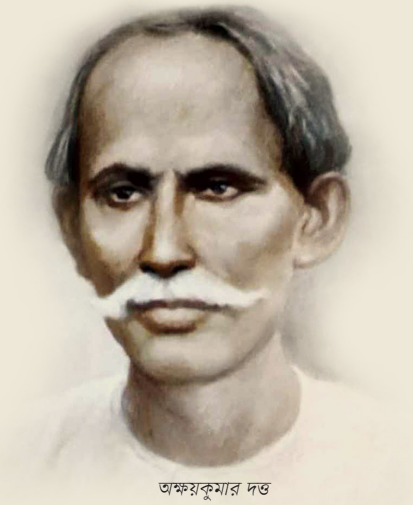

অক্ষয়কুমার দত্ত

বিদ্যাসাগরের মতোই দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন কৃতবিদ্য এলোপ্যাথি ডাক্তার। কিন্তু নানা ঘটনা ও পরীক্ষানিরীক্ষার পর বুঝলেন এলোপ্যাথি চিকিৎসা-রীতিতে পুরোপুরি রোগ সারে না। তাঁর ধারণা হলো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। তাই ডাঃ সরকার তাঁর পরবর্তী জীবনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেই সঙ্গী করেন। ভারতীয় বিজ্ঞানমন্দির (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স) প্রতিষ্ঠা (১৮৭৬) মহেন্দ্রলালের জীবনের অমর কীর্তি। দূরদর্শী মহেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন এদেশের দারিদ্র ও অজ্ঞতা দূর করতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন। আর দেশীয় বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে দেশের মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। প্রয়োজন একটি দেশি বিজ্ঞান গবেষণাগার। গবেষণাগার বা বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল এই রকম—"পূর্বকালে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার যথেষ্ট সমাদর ছিল। প্রাচীন হিন্দুরা আয়ুর্বেদ, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিজ্ঞানের বীজ রোপন করিয়াছিলেন, তবে দুঃখের বিষয় তার অনেককিছুই প্রায় লোপ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; তন্নিমিত্ত 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা' নামে একটি সভা কলকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।" সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে কিছু সহৃদয় ব্যক্তির দানে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এতে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের উদ্যোগ ও আর্থিক সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতকের বিশিষ্ট বঙ্গসাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পরিপূর্ণ বিজ্ঞান মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ। 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলি তাঁকে বিজ্ঞানলেখকের পরিচিতি দিয়েছিলো। তাঁর অধিকাংশ রচনাগুলি রসায়ন সম্পর্কিত হলেও ভূবিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শিল্পদ্রব্যাদির ওপরও বহু লেখা তিনি প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানের ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্ব আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার অন্তরালে ছিল সাহিত্যিক মনন। তা প্রকাশ পায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অব্যক্ত'-এ। এই গ্রন্থে অদৃশ্য আলোক, নির্বাক উদ্ভিদ জীবন এবং উদ্ভিদের স্নায়ুতে উত্তেজনাপ্রবাহ নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। এই গ্রন্থে 'গাছের কথা', 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু' এবং 'মন্ত্রের সাধনা' লেখাগুলি ছোটদের জন্য লেখা।

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের সম্রাট আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দর্শনের বেদীমূলে বিজ্ঞানকে বসিয়ে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। 'জিজ্ঞাসা', 'প্রকৃতি' ও 'বিচিত্র জগৎ' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাঁর মৃত্যুর পর 'জগৎ কথা' প্রকাশিত হয়। পরিভাষা সংকলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', 'রাসায়নিক পরিভাষা', 'বৈদ্যক পরিভাষা', 'ভৌগোলিক পরিভাষা', 'শারীর-বিজ্ঞান পরিভাষা' রামেন্দ্রসুন্দরের অমরকীর্তি।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের অন্যতম রূপকার জগদানন্দ রায়ের বিজ্ঞান গ্রন্থগুলি শিশু ও কিশোরদের উদ্দেশ্যে রচিত। ১৯১১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞান শিক্ষক জগদানন্দ কম করে ১৫ খানি বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি পরিচয়' (১৯১১), শেষ গ্রন্থ 'নক্ষত্র চেনা' (১৯৩১)।

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে সাহিত্য যে অন্যতম মাধ্যম, তা আগেই আলোচিত হয়েছে। এভাবেই আরো একজন বিজ্ঞান সাহিত্যিক বিজ্ঞানের সেবা করেছেন। তিনি হলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁর রচনার প্রধান গুণ সরসতা। কঠিন তথ্য বিবরণীর মধ্যেও বৈজ্ঞানিক কৌতুক কাহিনীর প্রয়োগে তাঁর রচনা চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতো। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'নব্যবিজ্ঞান' (১৯১৮) প্রকাশিত হয়। এতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের ইতিহাস ও আবিষ্কার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর গ্রন্থগুলোকে প্রকাশকাল অনুযায়ী পরপর সাজালে এইরকম হবে—'নব্যবিজ্ঞান' (১৯১৮), 'বাঙালির খাদ্য' (১৯২৬), 'বিশ্বের উপাদান' (১৯৪৩), 'তড়িতের অভ্যুত্থান' (১৯৪৮), 'ব্যাধির পরাজয়' (১৯৪৯), 'বিজ্ঞান প্রবেশ' (১৯৪৯),

ষোড়শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে দুই বিজ্ঞানীর ভাবনায় ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষ

ভূপতি চক্রবর্তী

ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বিজ্ঞান চর্চার পরিকাঠামো বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। মহেন্দ্রলাল সরকার সম্ভবত বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সেই সময়কার অতি সীমিত সুযোগের কথা মাথায় রেখে বিজ্ঞান বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করে তোলার জন্য ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অব সায়েন্স। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস (১৮৫৮ - ১৯৩৭) এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১ - ১৯৪৪) আমাদের দেশের প্রথম দুই আধুনিক গবেষক-বিজ্ঞানী ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক। তারা দুজনেই বিদেশ থেকে উচ্চতর শিক্ষালাভের পরে দেশে ফিরে গবেষণা ও পাঠদানের কাজ কাঁধে তুলে নেন। তাদের হাত ধরে উঠে আসেন একদল উজ্জ্বল ছাত্র যাদের মধ্যে রয়েছেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জী প্রভৃতি। এই দলটির থেকে বয়সে সামান্য বড় চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন ও দেবেন্দ্রমোহন বোস বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই বিজ্ঞানে গবেষণা ও শিক্ষকতায় গভীর অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতার আগে স্যর রামনের পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয় আমদের দেশকে গৌরবান্বিত করেছে এবং পরাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের যাত্রা শুরুতে এই গোষ্ঠীর সকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

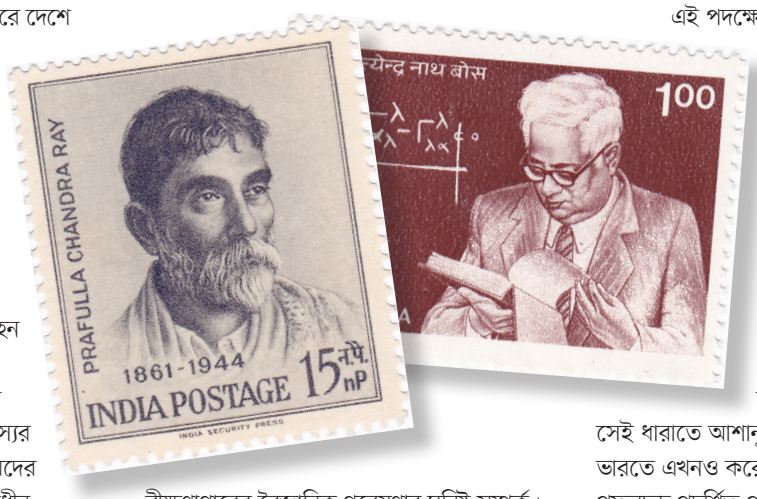

বিজ্ঞানীর কাজ সর্বদা কেবল গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যখন তাকে আন্দোলিত করে, বিশেষ করে পরাধীন দেশের এক নাগরিক হিসেবে তার চিন্তা যখন দেশের একেবারে সাধারণ মানুষের হিতাহিত ঘিরে আবর্তিত হয় তখন তিনি আর নিছক শিক্ষক বা গবেষক-বিজ্ঞানী থাকেন না। তিনি হয়ে ওঠেন এক সমাজ সংস্কারক, দখল করেন এক বিশিষ্ট স্থান। এই পরিপ্রেক্ষিতটি মাথায় রেখে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসের ভূমিকা নিয়ে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই সময়কার সকল ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সংক্ষেপে তুলে ধরা যাক এই দুই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের কথা।

প্রথমে বয়জ্যেষ্ঠ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা। প্রফুল্লচন্দ্র একদিকে যেমন পরীক্ষাগারে বা তার ভাষায় 'বীক্ষণাগারে' কাজ করতে খুবই দক্ষ ও আগ্রহী ছিলেন তেমনই তিনি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন রসায়নশাস্ত্রের জ্ঞান বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য। ১৯৩৭ সালে, যখন তার বয়স পঁচাত্তর অতিক্রম করেছে তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা লিখছেন 'আত্মচরিত' গ্রন্থে যা প্রকৃতপক্ষে তার আত্মজীবনী। দেখা যাচ্ছে যে সেখানে তিনি লিখছেন (পৃষ্ঠা ১২০) "ইওরোপে শিল্প ও বিজ্ঞান পাশাপাশি চলিয়াছে। উভয়েই একসঙ্গে চলিয়াছে। একে অপরকে সাহায্য করিয়াছে। বস্তুত আগে শিল্পের উদ্ভব তাহার পরে আসিয়াছে বিজ্ঞান। .... ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্পের যে বিরাট উন্নতি হইয়াছে তাহার সঙ্গে বীক্ষণাগারের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঘনিষ্ট সম্পর্ক। বাংলাদেশে কতগুলি টেকনোলজিক্যাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় নহে; সফল ব্যবসায়ী বা শিল্পপ্রদর্শক হইতে হইলে যে সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কর্ম্মকৌশলের প্রয়োজন বাংলার যুবাদের পক্ষে তাহাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে"। (বানান অপরিবর্তিত)

দেশের স্বাধীনতা লাভের বেশ কিছু আগে থেকেই কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের দেশে শিল্প গড়ে তোলার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। কেবল তাই নয় তিনি তার বিদেশের অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে সেই কাজে সফল হতে গেলে ল্যাবরেটরির গবেষণাকাজের সঙ্গে শিল্পের প্রয়োজনীয়তার যথাযথ মেলবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। আমরা জানি যে আচার্য রায় কেবল এই কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি তিনি নিজে তার রসায়নের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আজ থেকে প্রায় একশ' পঁচিশ বছর আগে গড়ে তুলেছিলেন এক রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান, 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড'। তবে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আগে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর রসায়নের জ্ঞানের প্রয়োগ করে গড়ে তুলেছিলেন এক ছোটখাট ওষুধ তৈরির ল্যাবরেটরী। এই কাজে তিনি কয়েকজন ভালো সহযোগী ও সহকারী পেয়েছিলেন, এবং তখনই আচার্য তার রসায়নের জ্ঞানকে শিক্ষকতার বাইরে প্রথম প্রয়োগ করতে শুরু করেন। এটি ছিল বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে তোলার জন্য সলতে পাকানোর কাজ। পরাধীন ভারতে প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সম্ভবত প্রথম মানুষ যিনি তার উচ্চ শিক্ষাকে গাবেষণার কাজে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ করলেন শিল্প গড়ে তুলতে।

এই পদক্ষেপ কেবল পরাধীন ভারতে নয়, স্বাধীন ভারতের জন্যও ছিল এক রোল মডেল। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পক্ষেত্রের এই মেলবন্ধন কতটা জরুরি তা আমরা এখনকার সময়েও বুঝতে পারি। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যেখান থেকে শুরু করেছিলেন যে ধারার গোড়াপত্তন তিনি করেছিলেন সেই ধারাতে আশানুরূপ গতিসঞ্চার আমরা স্বাধীন ভারতে এখনও করে উঠতে পারিনি। তবে প্রফুল্লচন্দ্র প্রদর্শিত পদক্ষেপগুলি সর্বদাই দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সত্যেন্দ্রনাথ বোস (১৮৯৪–১৯৭৪) ছিলেন বিজ্ঞান ও গণিতের এক অসাধারণ ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে অল্প কিছুদিন পড়ানোর পরে পদার্থবিদ্যা বিভাগের রিডার পদে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯২১ সালে। সেখানে গিয়ে সাতাশ বছরের সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন যে তখকার ঢাকা শহর শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে সেই সময়কার কলকাতার তুলনায় অনেকটাই অসুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে। পাওয়া যায় না অথচ প্রয়োজনীয়, এমন জিনিসের তালিকা সেখানে দীর্ঘ। সেখানে তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্রিকা বা জার্নালের অভাব। তাছাড়া বিজ্ঞান চর্চাকারী উৎসাহী শিক্ষক-গবেষক গোষ্ঠী ও বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী উপযুক্ত

যথেষ্ট ছাত্রের অভাব। সর্বোপরি একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার, লাইব্রেরি ও সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রের একান্ত অপ্রতুলতা।

এই সব কিছুকে খুব বড় করে না দেখে সত্যেন্দ্রনাথ একদিকে শুরু করলেন তার পাঠদানের কাজ অন্যদিকে তার গবেষক সত্ত্বা আবর্তিত হতে লাগলো তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার কিছু মৌলিক সমস্যাকে ঘিরে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি রচনা করলেন প্ল্যাঙ্কের সূত্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প পথ। ১৯২৪ সালে সেই পেপার ঢাকা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ পাঠালেন বার্লিনের অধ্যাপক অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে। অনুরোধ করলেন; সম্ভবপর হলে তা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে। আইনস্টাইন সেই পেপারের জার্মান ভাষায় অনুবাদ করলেন। মাত্র এক মাসের মধ্যে সেটি প্রকাশিত হলো, রচিত হলো এক ইতিহাস, পদার্থবিদ্যার জগৎ পেয়ে গেলো বিশেষ এক গোষ্ঠীর মৌল কণিকার আচরণ বুঝে উঠবার এক চাবিকাঠি, যার নাম বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স বা নিছকই বোস স্ট্যাটিস্টিক্স। একদল মৌল কণিকা বোস স্ট্যাটিস্টিক্স মেনে চলে, তারা পরিচিত বোসন নামে। অনেকের মতে, সত্যেন্দ্রনাথের এই কাজ ছিল একদিকে পুরাতন কোয়ান্টাম তত্ত্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ অন্তিম কাজ, কারণ তারপরই গোড়াপত্তন হয়েছিল আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার। সত্যেন্দ্রনাথের ১৯২৪ এর সেই পেপারের পরের ঠিক তিন তিনটি বছরে তিনটি ল্যান্ডমার্ক পেপার; ১৯২৫ সালে ভার্নার হাইজেনবার্গ, ম্যাক্স বর্ন, পাস্ক্যাল জঁরডার, ম্যাট্রিক্স মেকানিক্স, ১৯২৬ সালে স্রোয়ডিঙ্গারের ওয়েভ মেকানিক্স এবং ১৯২৭ সালে ভার্নার হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির ওপর প্রকাশিত তিনটি গবেষণাপত্র উন্মুক্ত করে দিল আধুনিক কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পথ। ঢাকা শহরে, সর্ব অর্থে বিজ্ঞান গবেষণার প্রাণবন্ত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন সত্যেন্দ্রনাথ যে দিকদর্শী কাজ করেছিলেন তা তার মেধা ও স্বকীয় চিন্তাশক্তিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে।

আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের খুব বড় অবদান আমরা পাই ভারতের স্বাধীনতার ঠিক পরেই, এবং তার গুরুত্ব ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি সম্ভবত স্বাধীনতার আগেই অনুভব করেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে বিষয়টির ভূমিকা। আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় ছিয়াত্তর বছর বয়সে রচিত অনবদ্য বিজ্ঞান গ্রন্থ "বিশ্বপরিচয়" উৎসর্গ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে সেই ১৯৩৭ সালে। সম্ভবত সেটি ছিল সত্যেন্দ্রনাথের জন্য এক বিশেষ অনুপ্রেরণা। বাংলা ভাষায় গভীরভাবে ও সর্বস্তরে বিজ্ঞান চর্চা ও প্রসারের লক্ষ্যে তিনি স্বাধীনতার মাত্র এক বছর পরে ১৯৪৮ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার দিশা তথা প্রেরণা এইরকম মাপের একজন মানুষের কাছ থেকে না এলে সেখানে কাঙ্খিত গতিবেগ সম্ভবত সঞ্চারিত হত না। তাই একেবারে সর্বস্তরে না হলেও অন্তত স্নাতক স্তর পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যে বিজ্ঞান পড়ানো হয়, তা কিন্তু আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার মধ্যে দিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে বিদ্যালয় স্তরের ছাত্র বা বিজ্ঞানে উৎসাহী সাধারণ মানুষের কাছে। এই চর্চায় যুক্ত হতে এগিয়ে এসেছেন অনেকে। সবচেয়ে বড় কথা ভারতবর্ষের অন্য প্রাদেশিক ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের এই উদ্যোগ বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছে; কাজ করেছে একটা মডেল হিসেবে। বর্তমান ভারতে আমাদের দেশের মূল ভাষাগুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখি যে যথেষ্ট হচ্ছে তার মূলে রয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারতবর্ষের মত বিরাট গণতান্ত্রিক দেশে প্রাদেশিক ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞানের প্রসার মানুষকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার জন্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বাধীন ভারত প্রত্যক্ষ করে যেতে পারেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ প্রয়াত হয়েছেন ১৯৭৪ সালে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনা এবং সমাজে তার বিপুল প্রভাবের কারণে আজকের ভারতবর্ষে তাদের দেখানো পথ হুবহু অনুসরণ করা তুলনায় হয়ত কঠিন হয়ে গেছে। কিন্তু এই দুই প্রথম সারির বিজ্ঞানী-শিক্ষক আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে বিজ্ঞানের শ্রেণিকক্ষের ও পরীক্ষাগারের বাইরে বেরিয়ে করার মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্র ও দায়িত্ব রয়েছে একদিকে গবেষক-বিজ্ঞানীদের ও অন্যদিকে বিজ্ঞানোৎসাহী মানুষের। তাঁদের চিন্তা ও তার প্রয়োগ একদিকে আমাদের দেখাতে পারে বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার পথ অন্যদিকে তা হয়ে উঠতে পারে সুস্থ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তোলার চাবিকাঠি। এই শিক্ষাই আমাদের বড় প্রাপ্তি। •

নিবন্ধকার কলকাতার সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রক্তন অধ্যাপক ও বিজ্ঞান-লেখক। ই-মেল: chakrabhu@gmail.com

চতুর্দশ পৃষ্ঠার পর

'পদার্থবিদ্যা' (১৯৫০), 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ' (১৯৫১), 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী' (১৯৫৩), 'পরমাণুর নিউক্লিয়াস' (১৯৬২)। তিনি 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রকৃতি', 'ভান্ডার' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

বাংলায় বিজ্ঞান-সাহিত্য চর্চার পরিসরে প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের উপস্থিতি দৃষ্টি-আকর্ষক। ভাবলে অবাক হতে হয়, গোপালচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনে আটশোর মতো বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী, কাজের লোক, বঙ্গশ্রী, উদয়ন, মন্দিরা, পথ, নবারুণ, প্রকৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, দেশ, সন্দেশ, নতুনপত্র, অলোকা-র মতো পত্র-পত্রিকাতে। কীট-পতঙ্গ, পশুপাখি ছাড়াও আবিষ্কারমূলক, উদ্ভিদবিষয়ক ও বিজ্ঞানের সংবাদমূলক ছোটোবড়ো ২২টি বই তিনি লিখেছেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত (১৯৪৮) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে শুরু থেকেই নিবিড়ভাবে যুক্ত গোপালচন্দ্র আজীবন জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক, প্রধান সম্পাদক ও প্রধান উপদেষ্টার পদ অলংকৃত করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে) জনপ্রিয় বিজ্ঞান ঘরানায় উজ্জ্বল উপস্থিতি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর গদ্যরীতি, উপস্থাপনার আদল, কলমের মুনশিয়ানা, বিষয় নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দর্শন ও মনস্তত্ত্বের একান্ত বুদ্ধিনিষ্ঠ ছাত্র দেবীপ্রসাদ ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিবিজ্ঞানে অনুরাগী হন ও তাঁর লব্ধ জ্ঞান, অধীত বিদ্যা পরিবেশন করেন সুবোধ্য সরল বাংলা ভাষায় – শিশু ও কিশোর মন থেকে শুরু করে প্রৌঢ় মনের সমৃদ্ধির জন্য। বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান এবং ভাষা ব্যবহারের রীতিনীতি ছিল সু-আয়ত্ব। তাই তাঁর প্রয়াস ছিল ব্যাপৃত ও অভিনন্দনযোগ্য। ৫০-এর দশকে 'আমরাও হতে পারি' সিরিজের ৯টি বই, 'জানবার কথা' সিরিজের বেশ কয়েকটি বই, 'জীবনী বিচিত্রা' সিরিজের ৯টি বই সম্পাদনা করেন। 'জানবার কথা' সিরিজের ভূমিকায় দেবীপ্রসাদ লিখেছেন—'ইস্কুলের বই ছাড়াও ছেলেমেয়েরা আরো কিছু বই পড়তে চায়। পড়েও। আমরা ইস্কুলের আঙিনার বাইরেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসর জমাতে চেয়েছি। এ আসরে বোঝা-না বোঝার সঙ্গে পাস-ফেলের সম্পর্ক নেই। ওরা তাই সহজ হয়ে শুনছে। আমরাও সহজ করে বলছি।'—এ এক অসাধারণ সামাজিক উপলব্ধি তথা দৃষ্টিভঙ্গি। দর্শনের জটিল চিন্তার ফাঁকে তাঁর এই সহজ অনাবিল বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার প্রয়াস বিস্ময়কর। সমাজ গড়ার কারিগর ছিলেন দেবীপ্রসাদ। বললে এতটুকু অত্যুক্তি হবে না যে, পরবর্তীকালের বিজ্ঞান ক্লাব তথা জনবিজ্ঞান সংগঠনের মূল সুরটি এখানেই ধরা পড়েছিলো। •

লেখক পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও জনবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: joardar69@gmail.com

লেখকদের জন্য: বিজ্ঞান কথার জন্য অনধিক ১,০০০ শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, কল্পবিজ্ঞান রচনা, বিজ্ঞানের ছড়ার আমন্ত্রন জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা unicode font-এ টাইপ করা পান্ডুলিপি ও পৃথকভাবে রচনা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Vigyan Katha, Vigyan Prasar, A-50, Institutional Area, Sector 62, Noida 201309 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ই-মেল করুন vigyankatha@vigyanprasar.gov.in.